বিশ্বসেরা মুসলিম বিজ্ঞানী

মুহাম্মদ নূরুল আমীন

বিশ্বসেরা

মুসলিম বিজ্ঞানী

মুহাম্মদ নূরুল আমীন

র‍্যাক্স পাবলিকেশন্স
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

www.pathagar.com

বিশ্বসেরা মুসলিম বিজ্ঞানী

মুহাম্মদ নূরুল আমীন

ISBN : 978-984-90135-2-5

স্বত্ব : লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক

র‍্যাক্স পাবলিকেশন্স

২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

ফোন : ৯৬৭০৬৮৬

পরিবেশক

আহসান পাবলিকেশন, কাটাবন, ঢাকা।

মক্কা পাবলিকেশন্স, ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা।

মাওলা প্রকাশনী, ১৯১ বড় মগবাজার, ঢাকা।

খেয়া প্রকাশনী, ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ২০১৩
রবিউস সানী, ১৪৩৪
মাঘ, ১৪১৯

প্রচ্ছদ

নাসির উদ্দীন

কম্পোজ ও মুদ্রণ

র‍্যাক্স প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স লিঃ

কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস (৪র্থ তলা)

ফোন : ৮৬২২১৯৫

মূল্য ঃ একশত টাকা মাত্র

Bishow Sera Muslim Biggani Written by Muhammad Nurul Amin, Published by Raqs Publications, 230 New Elephant Road, Dhaka, First Edition February-2013, Price Tk. 100.00 Only.

RS-19

www.pathagar.com

সূচিপত্র

❖ বিজ্ঞানের যুবরাজ ইবনে সীনা ॥ ৫

❖ বিজ্ঞানী ও কবি ওমর ইবনুল খৈয়াম ॥ ১৭

❖ ইবনে নাফিস : ফুসফুসে রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতির আবিষ্কারক ॥ ২২

❖ দার্শনিক ও বিজ্ঞানী আল ফারাবী ॥ ২৯

❖ হাসান ইবনুল হাইছাম : ফটোগ্রাফীর জনক ॥ ৩৩

❖ বিজ্ঞান জগতে ইবনে যুহর পরিবার ॥ ৩৯

❖ ইবনে খালদুন : সমাজ বিজ্ঞানের জনক ॥ ৪৪

❖ মূসা আল খারিজমী : বীজগণিতের জনক ॥ ৪৯

❖ গণিতবিদ আবু রায়হান আল বিরুনী ॥ ৫৬

❖ দার্শনিক ও বিজ্ঞানী আল কিন্দি ॥ ৬১

❖ মনীষী ও বিজ্ঞানী ইবনে রুশ্‌দ ॥ ৬৫

❖ দার্শনিক ও যুক্তিবিদ মুহাম্মদ আল গাযালী ॥ ৬৮

❖ রসায়নবিদ জাবির ইবনে হাইয়ান ॥ ৭৯

❖ চিকিৎসাবিদ আবু বকর মুহাম্মদ বিন জাকারিয়া আর রাজী ॥ ৮৬

❖ চিকিৎসা বিজ্ঞানী আবুল কাসেম খালাফ আজ্জাহরাবী ॥ ৮৯

❖ বাঙালী চিকিৎসাবিদ মুহাম্মদ আল মাহাদী বিন আলী আল হিন্দ সুনপুরী ॥ ৯২

❖ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ইবনুল বায়তার ॥ ৯৪

❖ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ইবনে জুলজুল ॥ ৯৫

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের যুবরাজ ইবনে সীনা

ইবনে সীনা বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি নক্ষত্রোজ্জ্বল নাম। আরব সভ্যতার খ্যাতিমান, মৌলিক ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। বিজ্ঞান চর্চায় মুসলমানদের নাম আসলে প্রথমেই তাকে স্মরণ করা হয়। পাশ্চাত্য দুনিয়াও তার মনীষা অবদানে প্রণত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তার বই পাশ্চাত্যের চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অবশ্য পাঠ্য ছিলো। ইবনে সীনার মনীষী দ্যুতি হারিয়ে যায়নি আজও।

সংক্ষিপ্ত জীবনকাল

আবু আলী হোসাইন আবদুল্লাহ ইবনে সীনা ৯৮০ ঈসায়ী সনের আগস্ট মাসে বুখারার 'আফসানা' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে ৬ বছর বয়সে তিনি স্কুলে ভর্তি হন এবং ১০ বছর বয়সে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ মুখস্থ করেন। এর মধ্যে তিনি আরবী সাহিত্য অধ্যয়ন করে ফেলেন। তৎপর বিভিন্ন শিক্ষকের নিকট হতে ইসলামী, ফিকাহ্ ও কালাম শিক্ষা করেন। তিনি আবদুল্লাহ নাতিলীর নিকট দর্শন, জ্যামিতি এবং জ্যোতিষ বিজ্ঞানে দীক্ষা লাভ করেন এবং আপন প্রতিভাবলে এসব বিষয়ে তিনি তার শিক্ষককে ছাড়িয়ে যান। ঠিক এ সময়ে তিনি পদার্থবিদ্যা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে গবেষণা ও অভিজ্ঞতায় লব্ধ জ্ঞানের পরিপূর্ণতা সাধন করেন।

কথিত আছে, যখন চিকিৎসা বিদ্যার অস্তিত্ব ছিলো না তখন হিপোক্রিটাস তা সৃষ্টি করেন; যখন তা ধ্বংস হয়ে যায় তখন গ্যালন এটাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। যখন এটা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে তখন আল রাজী এটাকে সুসংঘবদ্ধ করেন; আর তা ছিলো অসম্পূর্ণ কিন্তু ইবনে সীনা এসেই তাকে পরিপূর্ণ রূপ দান করেন।

১৮ বছর বয়স পর্যন্ত ইবনে সীনা রাত-দিন অধ্যয়নে মগ্ন থাকতেন। নিদ্রা যাতে জ্ঞানার্জনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য তিনি নিদ্রা প্রতিরোধকারী এক রকম পানীয় পান করতেন। তন্দ্রা এবং নিদ্রাবস্থায়ও তার

www.pathagar.com

মনে বিভিন্ন প্রশ্নের উদয় হত, এমনকি কোনো কোনো জিজ্ঞাসার সমাধান তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে প্রাপ্ত হতেন।

ইবনে সীনা ইসমাঈলীয় প্রচারকদের দ্বারা প্রভাবিত হন এবং তাদের কাছে গ্রীক দর্শন, জ্যামিতি ও গণিত শাস্ত্রে প্রভূত পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পর্কে লিখিত সকল গ্রন্থের পাঠ তিনি শেষ করেন। এরিস্টটল, ইউক্লিড এবং টলেমীর গ্রন্থাবলীর সাথে তিনি পরিচিত হন। কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্রকে পেশা হিসেবে নিয়েছিলেন তিনি। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তার খ্যাতি এতই ছড়িয়ে পড়ে যে, সামানীয় সুলতান আরোগ্য লাভ করলে তিনি তাকে তার ইচ্ছা মাফিক যে কোনো কিছু দেবার ঘোষণা দেন। কিন্তু জ্ঞান পিপাসু ইবনে সীনা বাদশাহের নিকট লোভনীয় কোন কিছু না চেয়ে কেবল তার রাজকীয় মূল্যবান লাইব্রেরিতে অধ্যয়নের অনুমতি চান। সুলতান ইবনে সীনাকে তাঁর অভিপ্রায় মুতাবিক লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করেন। এতে তিনি এতই প্রীত হন যে, খাওয়া-দাওয়া নিদ্রা পর্যন্ত ত্যাগ করেন। এ সময় তিনি তার অপরিসীম বুদ্ধিমত্তা, অনন্য সাধারণ স্মৃতিশক্তি এবং বোধশক্তির মাধ্যমে প্রভূত জ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু তার এ অবস্থা বেশি দিন যেতে না যেতে ২০ বছর বয়সে তার পিতার মৃত্যু হয়। তিনি আরো বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন এর কিছুদিন পর সুলতান নূহের মৃত্যুতে। কারণ শাসনকর্তার মৃত্যুতে বুখারায় রাজনৈতিক গোলযোগ ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে তিনি বুখারা ত্যাগ করেন।

১০০১ ঈসায়ী সনে ইবনে সীনা খারিজম পৌছেন। সেখানে আলী বিন মামুনের দরবারে আল বিরুনী, আল ইরাকী, আবুল খায়ের প্রমুখ পণ্ডিত ও সূফীদের সাক্ষাৎ লাভ করেন। এখানে কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি ইরাকে রওনা হন। কিন্তু এখানেও বেশিদিন অবস্থান করতে না পেরে ১০০৯ ঈসায়ী সনে জুরজানে গমন করেন। এখানে এসে তিনি আরেক সঙ্কটের কবলে পড়লেন। ১০১৫ ঈসায়ী সনে জুরজান হতে 'রায়' এ যাত্রাকালে 'দায়লাম-এ-বুয়াহ' রাজত্বের অবসানে যে সকল ছোট ছোট রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল তিনি সেসব অঞ্চলসমূহে এক সঙ্কটময় অবস্থার সম্মুখীন হন। এ সময় তিনি কখনো মন্ত্রী, কখনো চিকিৎসক, কখনো দার্শনিক এবং কখনো বা উপদেষ্টার

www.pathagar.com

কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১০২২ ঈসায়ী সনের শুরুতে তিনি বুয়াইদ আমীর আজাদুদ্দৌলার পৃষ্ঠপোষকতায় বাস করতেন। আমীর ছিলেন একজন জ্ঞানানুরাগী ব্যক্তি। তিনি ইবনে সীনাকে যথেষ্ট সম্মান করতেন।

আমীরের কাছে থাকাকালে ইবনে সীনা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি ক্রমাগত কৃশ ও দুর্বল হয়ে পড়লে ইস্পাহানে গমন করেন। এখানে তিনি কিছুকাল ভালো থাকলেও পুনরায় হামাদান যাত্রা করেন। এখানে এসে তিনি তীব্রভাবে রোগাক্রান্ত হন। ফলে এ মহান বিজ্ঞানী ৪ রমাযান ৪২৮ হিজরী মুতাবিক, ১০৩৭ ঈসায়ী সনের জুন মাসে ইন্তেকাল করেন। হামাদানে এখনও তার কবর বিদ্যমান আছে।

ইবনে সীনা ছিলেন বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী। ল্যাটিনে Avicenna এবং হিব্রু ভাষায় Aven Sina নামে পরিচিত। সর্ব বিদ্যায় পারদর্শী, দার্শনিক, চিকিৎসক, গাণিতিক, জ্যোতির্বিদ, ভাষাবিদ, জ্যামিতি, শিল্পকলা, ধর্মতত্ত্ব, সঙ্গীত এবং কাব্যের উপর তার ছিলো অগাধ পাণ্ডিত্য। এ সকল শাখার উপর তিনি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন।

ইবনে সীনার রচনাবলী

দু'টি ফার্সীতে রচিত গ্রন্থ ব্যতীত তার সবগুলো গ্রন্থ আরবীতে রচিত। পদ্যেও তার কিছু রচনাবলী আছে। তিনি ১২৫টি, কারো মতে ১৮০টি গ্রন্থ রচনা করেন। ইবনে সীনার রচিত কতগুলো উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ নিম্নরূপ ঃ

১. কিতাব আশ্ শিফা : দর্শনের উপর একটি বৃহৎ বিশ্বকোষ। ১৮ খণ্ডে বিভক্ত এ রচনাটি তার অল্প বয়সের রচনা হলেও নিতান্ত বিশাল প্রকৃতির। মধ্যযুগের ইউরোপে এটি একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হতো। মুসলিম বিশ্বে এটি এখনও একটি মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। ১৩০৩ হিজরীতে তেহরানের লিথো প্রেসে এর কয়েক খণ্ড মুদ্রিত হয়। এর কোনো কোনো খণ্ডের অনুবাদ ল্যাটিন ভাষায়ও আছে। এতে তিনি সমগ্র দর্শন ছাড়াও ন্যায়শাস্ত্র এবং অধিবিদ্যার উপর আলোচনা করেন।

২. আল কানুন ফিত্ তীব : চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর লিখিত তার বিশ্ব বিশ্রুত গ্রন্থ। চিকিৎসা শাস্ত্রের এই বিশ্বকোষ ইউরোপে Canon of Medicine নামে

www.pathagar.com

পরিচিত। ইবনে সীনার আরবী পদ্ধতির শীর্ষস্থানীয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল কানুন চিকিৎসা বিজ্ঞান ও শল্যবিদ্যা সম্পর্কীয় এক পরিপূর্ণ বিশ্বকোষ। এ গ্রন্থে রোগ, ঔষধ ও অসংখ্য রোগের চিকিৎসার সমাধান দেয়া হয়েছে। এ গ্রন্থে রোগ নিবারণ ও ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধেও বিশদ আলোকপাত করা হয়েছে। ভেষজ দ্রব্যগুণ বিষয়ে ঔষধসমূহের যথার্থ তত্ত্ব এবং ভেষজবিদ্যার অনুসরণীয় পদ্ধতিসমূহের একটি নকশাও তিনি এতে অঙ্কন করেছেন।

ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে 'আল কানুন' এর প্রভাবকে অতিরঞ্জিত করা যায় না। স্যার টমাস ক্লিফোর্ড আলবুট Encyclopaedia Britanica' তে বলেন, 'ইবনে সীনার 'কানুন' হিপোক্রিটাস (চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক) এবং মধ্যযুগীয় দিকপাল গ্যালেনের কৃতিত্বকে ম্লান করে দিয়েছিল'। অধ্যাপক হিট্টি বলেন, 'দ্বাদশ শতক হতে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত পশ্চিমা দেশগুলোতে এ গ্রন্থটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রধান পথ প্রদর্শক ছিলো। মুসলিম বিশ্বে এখন পর্যন্ত বিশেষ করে ইউনানী পদ্ধতির এটি প্রধান প্রামাণ্য গ্রন্থ'। Dr. William Osler 'The Evolution of Modern Medicine' নামক গ্রন্থে ইবনে সীনার আল কানুন সম্পর্কে মন্তব্য করেন, 'এটি যে কোন গ্রন্থের তুলনায় দীর্ঘতর সময় মেডিকেল বাইবেলরূপে রয়েছে'। পশ্চিমা বিশ্বে ইবনে সীনা এতবেশি সম্মানিত যে চিকিৎসা অনুষদের বিরাট হল ঘরে তার প্রতিকৃতি শোভা পাচ্ছে।

মুদ্রণ পদ্ধতির আবিষ্কারের ৩০ বছর পর ১৪৭৬ ঈসায়ী সনে রোম হতে এটি ৪ খণ্ডে মুদ্রিত হয়। 'কানুন' এর ল্যাটিন অনুবাদ সর্বপ্রথম Cremonese এর Gherardo করেন, ভেনিস ১৫৪৪ ঈসায়ী সনে কয়েক খণ্ড অনুবাদ ঈসায়ী সনে ১৫ শতক শেষ হওয়ার পূর্বে মুদ্রিত হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীতে 'আল কানুন' ২০ বারেরও বেশি বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়। সম্ভবত আজ পর্যন্ত চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর লিখিত এত জনপ্রিয় এবং বহুল পাঠ্য গ্রন্থ রচিত হয়নি।

৩. আল্ আদাবিয়াতুল কলবিয়া : চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর লিখিত ইবনে সীনার দ্বিতীয় পুস্তকের নাম। Bilge যা তুর্কী ভাষায় অনুবাদ করেন এবং আরবী মূল ইবারতসহ ইবনে সীনার নবম শতবার্ষিকীতে স্মৃতিপুস্তক হিসেবে প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

৪. রেসালায়ে ফিল হিকমা ওয়াত তাবয়ীয়াহ : পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত এ গ্রন্থে তিনি পদার্থবিদ্যা, নভোমণ্ডলীয়, পদার্থসমূহ, মানবীয় বৃত্তি সম্বন্ধে, চিন্তামূলক ও সীমা নির্দেশক বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়া শাস্ত্র, চুক্তি, বর্ণমালা সম্বন্ধে এতে পৃথক পৃথক প্রবন্ধমালা রয়েছে।

৫. উয়ূন আল্ হিকমাত : দশ খণ্ডে বিভক্ত দর্শনের উপর লিখিত গ্রন্থ।

এছাড়া সাদিদীয়া, দানেশ্নামা, কিতাবু লিসানুল আরাবী ফিল্ লুগাত, কিতাবুল হাইয়ান ওয়ান নাবাত, আন্ নাজাত, আল্ আনমাতুছ ছালাছাল আখিরা, রিসালাতুজ-জাওয়ারা ইত্যাদি তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সম্ভারের মধ্যে অন্যতম। এসব গ্রন্থ রচনা ছাড়া তিনি বিজ্ঞান ও দর্শনের উপর অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেন। তবে তার শ্রেষ্ঠ অবদান হলো 'আশ্ শিফা' এবং 'কানুন ফিততীব'। এ দু'টি গ্রন্থের জন্য তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

ইবনে সীনার দর্শন

মুসলিম জাহানের একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ হিসেবে ইবনে সীনা ছিলেন প্রাচ্যে শেষ এবং শ্রেষ্ঠ এরিস্টটলীয় দার্শনিক। তার প্রচেষ্টায় এরিস্টটলীয় দর্শন চর্চা সর্বোচ্চ সীমায় উপনীত হয়েছিল। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ফারাবীয় শিষ্য। তিনি প্রথমে দর্শন বহু চেষ্টার পরেও বুঝতে পারছিলেন না। পরে ফারাবীর রচনাবলী পাঠের ফলে তিনি এরিস্টটলের গভীর দার্শনিক চিন্তাধারায় প্রবেশ করেন। ফারাবীর রচনাবলীই তাকে দার্শনিক মানস গঠনে সহায়তা করে এবং তিনি এরিস্টটলের গ্রন্থের ব্যাখ্যা প্রদানে অনুপ্রাণিত হন। তিনি তাঁর সঞ্চিত জ্ঞানের মাধ্যমে এরিস্টটল এবং প্লেটোর দর্শনের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে আপন চিন্তাধারাকে সমৃদ্ধ করেন। বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থাবলী এবং মতবাদ সম্পর্কে তিনি ব্যাখ্যা দিয়ে নিজস্ব দার্শনিক চিন্তাধারাকে নতুনরূপে সাজান। তার ধারণা যে, দর্শন ধর্ম হবে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। দর্শনের কাজ যুক্তির সাথে ঈমানের সমন্বয় সাধন নয়; বরং যুক্তির সাহায্যে জীবনের সমস্যাবলীর ব্যাখ্যা করাই এর কাজ। ইবনে সীনার মতে, দর্শন চর্চার মাধ্যমেই পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জন সম্ভব।

আল্লাহ সম্পর্কে ইবনে সীনার মতবাদ হচ্ছে, আল্লাহ অপরিহার্য সত্তা। তিনি

www.pathagar.com

কাল, সীমা ও গতির ঊর্ধ্বে। তার মতে দু'ধরনের সত্তা আছে– 'সম্ভাব্য' ও 'অপরিহার্য'। সম্ভাব্য সত্তা অপর কোনো সত্তা হতে বিকাশ লাভ করে; কিন্তু অপরিহার্য সত্তা সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোনো কিছুর সাথে এটি সম্পর্কিত নয়। একাধিক বা একটি কারণ হতে সম্ভাব্য সত্তা জন্মলাভ করে; পক্ষান্তরে অপরিহার্য সত্তা কোনো কারণজাত নয়। সম্ভাব্য সত্তা ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু অপরিহার্য সত্তা চিরন্তন। এই অপরিহার্য সত্তা-ই মহান আল্লাহ। অপরিহার্য সত্তার সংজ্ঞামাত্র একটি। সত্তার গুণাবলী তার অস্তিত্বের সাথে অভিন্ন। ইবনে সীনা তার দার্শনিক মতবাদে 'আত্মার' উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তার শ্রেষ্ঠ দার্শনিক গ্রন্থ 'The Healing' মনস্তত্ত্বকে কেন্দ্র করে তার আত্মা সম্পর্কীয় মতবাদের উদ্ভব। তার মতে, দেহ ও আত্মার অপরিহার্য কোনো পারস্পরিক সম্পর্ক নেই। আত্মা একটি অবিনশ্বর সত্তা এবং এটি আল্লাহর নিকট হতে এসেছে, দেহের কোনো অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়। তার মতে, সকল সত্তার মৌলিক কারণ আল্লাহ। সমস্ত জড় জগৎ আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। কেননা, তিনি ব্যতীত কোনো অস্তিত্বই রূপ লাভ করতো না।

মানব সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে প্লেটোর মতবাদ অধিকাংশ আরব দার্শনিক মেনে নিলেও ইবনে সীনা তা গ্রহণ করেননি। তার অভিমত হলো, আত্মাসমূহ অন্তকাল পূর্ব হতেই তৈরি হয়ে আছে। মৃত্যুর পরেও পুনরুত্থান সম্বন্ধে তিনি ইসলামের 'প্রত্যাবর্তন' সূত্রই অনুসরণ করেন। এরিস্টটলের অনুসারী হলেও ইবনে সীনা আল্লাহ ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কীয় প্রশ্নে গ্রীক দর্শনের ভিন্ন মত পোষণ করতেন। এরিস্টটলের মতবাদ হলো– 'জগৎ চিরন্তন। আল্লাহ বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা নন; বরং তার গতিধারার নিয়ন্ত্রক'। পক্ষান্তরে ইবনে সীনা বলেছেন যে, এই বিশ্ব অনন্ত এবং তা 'আদি কারণ' আল্লাহর সৃষ্টি। এই সূত্রই কার্যকারণের যুগপৎ ঘটমান প্রকৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করে।

ইবনে সীনা ও পদার্থবিদ্যা

ইবনে সীনার নিকট পদার্থবিদ্যা একটি চিন্তামূলক শিল্প। যার দ্বিবিধ বিষয়বস্তু আছে। (১) বাস্তবে স্থিত বস্তুসমূহ এবং (২) ধারণাগত বস্তুসমূহ। পদার্থবিদ্যায় তিনি গতি, মিলন, শক্তি, শূন্যতা, অসীমতা, আলোক ও উত্তাপ

www.pathagar.com

সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, আলোক অনুভূতির কারণ যদি আলোক কেন্দ্র হতে আলোক কণা বিচ্ছুরণ হেতু হয় আলোকের গতি সসীম থাকবে। তিনি নির্দিষ্ট ওজনের আলোচনাও করেছেন। 'তিসআ রিসালা ফি হিকমাতি ওয়াত তারয়িয়াহ' নামক গ্রন্থে তিনি পদার্থবিদ্যা বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যার পৃথক পৃথক আলোচনা করেছেন। ইবনে সীনার মতে, ধাতুসমূহের পরস্পর রূপান্তরকরণ সম্ভব নয়, কেননা এরা মূলত বিভিন্ন। মনে হয়, তিনি যেন ধাতুর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তার প্রবন্ধ 'মা দুনিয়াত' (খনিজ পদার্থসমূহ) ১৩শ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে ভূতত্ত্ব বিষয়ে ধ্যান-ধারণার একমাত্র উৎস ছিলো।

জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ইবনে সীনা

পর্যবেক্ষণ বিশুদ্ধ করতে হলে বিশুদ্ধভাবে গণনা করার উপযোগী যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচনা করতে গিয়ে বিশুদ্ধতর গণনা করার উপযোগী যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের চিন্তাই ইবনে সীনাকে প্রথমে পেয়ে বসে। এই বিদ্যার প্রতি তার এতই অনুরাগ ছিলো যে, শেষ বয়সে তিনি গতিশীল পরিমাপ যন্ত্রেরও ন্যায় (Vernier) সূক্ষ্ম গণনা করার উপযোগী একটি যন্ত্রও আবিষ্কার করেন। এর মাধ্যমে যেন যান্ত্রিক সংযোজন নিখুঁতভাবে হয়ে থাকে। এ শাস্ত্রে ইবনে সীনার প্রভূত জ্ঞান ছিলো। তিনি কয়েকটি জ্যোতিষ্ক-বিক্ষণাগার স্থাপন ছাড়াও হামাদানে কয়েকটি মানমন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন।

মনোবিজ্ঞান

মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় ইবনে সীনা ক্রমানুসারে উদ্ভিদ মন (নফসে নাবাতি) হতে আরম্ভ করেও জীবন মন (নফসে হাইওয়ানি) এবং জীবন মন হতে আরম্ভ করেও মানব মন (নফসে ইনসানী) অথবা (নফসে নাতেকা) এর দিকে অগ্রসর হয়েছেন। মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে তার লিখিত গ্রন্থের নাম 'কিতাব আন্ নফস'।

ক. উদ্ভিদ মনে বিভিন্ন শক্তি কাজ করছে। যথা : খাদ্য সংগ্রহণী শক্তি, প্রজনন শক্তি।

www.pathagar.com

খ. জীব-মন দু'টি শক্তি। অনুভব এবং গতিশক্তি নিয়ে তা গঠিত। গতিশক্তি আবার দু'ভাগে বিভক্ত। উদ্দীপক শক্তি– যার কাজ শক্তি উৎপাদন করা এবং কর্মশক্তি- স্নায়ুমণ্ডলী এবং গোস্ত পেশির উপর ক্রিয়াশীল।

গ. মানবীয় মন নিজ প্রাথমিক অনুভূতিগুলোকে বুদ্ধি ও বিভিন্ন পর্যায়ে পৌঁছাবার জন্য বিভিন্ন গুণ অর্জন করে। তা বাহ্যিকও হতে পারে এবং অভ্যন্তরীণও হতে পারে। বাহ্যিক গুণাবলীর প্রথমটি হলো মনঃসৃষ্টি Phantasy এবং তা ঐ সমস্ত দৃশ্য-অদৃশ্য বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট যা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করা যায়। এর পরবর্তী গুণাবলীগুলো হলো– রূপায়ণ শক্তি, কল্পনা শক্তি, ধারণা শক্তি ও স্মরণ শক্তি। ইবনে সীনার মতে এগুলো মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের সাথে সম্পর্কিত।

শরীয়ত ও সূফীতত্ত্ব

ইবনে সীনা তার 'ইশারাত' গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে 'মাকামাতুল আরেফীন' তথা তত্ত্বজ্ঞানী আলোচনা প্রসঙ্গে তাসাউফ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তার মতে, তত্ত্বজ্ঞানী তিনিই যিনি মানতিক ও ইল্‌ম-এর পথ হতে সরে এসে 'হাকীকত'-এর নৈকট্য ও মিলন লাভ করে আল্লাহর রাজ্যে উপনীত হন। আরিফগণের কয়েকটি ঘাঁটি পার হতে হয় এবং তার বিভিন্ন স্তরও রয়েছে। এ সমস্ত পর্যায়গুলোর মধ্যে রয়েছে– অনাসক্ত জীবন, সংযমশীলতা, কৃচ্ছ্রতা সাধন, মৌলিক স্বীকৃতিকে ক্রমে মিলনজনিত বিস্মৃতির অবস্থায় পরিণত করা। প্রখ্যাত সূফীতত্ত্ববিদ আবু সাঈদ আবুল খায়েরের নিকট লিখিত ইবনে সীনার পত্রাবলী তাসাউফের প্রতি তার অনুরাগের সাক্ষ্য দেয়। এ বিষয়ে তার লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে– 'ইশক, রিসালা ফি মাহিয়্যাতিস সলাত এবং কিতাব ফি মানাজ জিয়ারা'। তন্মধ্যে ৪টি পুস্তক লাইডেন হতে ১৮৯৪ ঈসায়ী সনে এবং Mehren কৃত ফরাসী ভাষায় অনুবাদ ও মূল ১৮৯৯ ঈসায়ী সনে প্রকাশিত হয়েছে।

ইবনে সীনার ঐশীতত্ত্ব ফারাবী এবং রাসাইলু ইখওয়ানিস সাফা-এর সমন্বয়ে গঠিত। দার্শনিক স্বীকার করেন যে, আকলের সাথে ঈমান থাকা আবশ্যক। ইবনে সীনার মতে, ঈমান আকলের পরিপূর্ণ রূপ : সুতরাং

www.pathagar.com

ঈমানই আকলকে পূর্ণতা দান করে। তার মতে, শরীয়ত হিকমতের বিপরীত নয়। তার অস্তিত্ব পরস্পরের জন্য আবশ্যক।

ইবনে সীনা আরো বলেন, রাসূলগণের মর্যাদা দার্শনিকদের উর্ধ্বে এবং ওহীর স্থান হলো এক মহান এবং উন্নত অনুভূতির। ওহী, ইলহাম এবং স্বপ্ন আল্লাহর প্রজ্ঞার অংশবিশেষ। তার মতে শরীয়তের কাজ হলো– 'মানব জাতি সংশোধন'। প্রশাসনিক এবং আধ্যাত্মিক এ দ্বিবিধ উপায়ে শরীয়তের কাজ সংগঠিত হয়। এদের পরিপূর্ণতা সাধনের জন্য নবীগণ যেভাবে ইখতিয়ার প্রাপ্ত তা সাধারণ মানুষের জন্য নয়। শরীয়ত এবং প্রজ্ঞা (হিকমত) এর ব্যাপারে ইবনে সীনা শরীয়তের নিকটতর। এ জন্য তার সমস্ত দর্শন ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত ধর্মতত্ত্বের সাথে মিশেছে।

ইবনে সীনার ধর্মবিশ্বাস

ইবনে সীনার পরিবার ছিলো শিয়া মতবাদে বিশ্বাসী। তিনি সেই পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও শিয়া আকীদা ও বিশ্বাস গ্রহণ করেননি বলে নিজেই উল্লেখ করেছেন। তিনি কোন মাজহাবের অনুসারী ছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে তার গ্রন্থ 'রেসালায়ে জুদীয়া' (ফার্সী ভাষায় রচিত) এর ৭২ পৃষ্ঠাব্যাপী উর্দু ভূমিকা রচনা করতে গিয়ে হাকীম সৈয়দ জিল্লুর রহমান, (রিসার্চ অফিসার, মুসলিম ইউনিভার্সিটি, আলীগড়) লিখেছেন– 'মুহিউদ্দীন ইবনে আবিল ওয়াফা 'আল জওয়াহেরুল মুজিয়া ফি তব্‌কাতিল হানাফিয়া'- নামক গ্রন্থে ইবনে সীনাকে হানাফী আখ্যায়িত করে শুধু এতটুকু লিখেছেন যে, তিনি হামাদানে ইন্তেকাল করেন' (পৃষ্ঠা-২৩)।

ইবনে আবিল ওয়াফা (হি. ৬৯৬/৭৭৫) ইবনে সীনাকে হানাফী মাজহাবের অনুসারী বলে তার ধর্মীয় আকিদা বিশ্বাসের আরো একটি দিক তুলে ধরেছেন। হানাফী ওলামাদের উপর রচিত এই গ্রন্থটির নাম হতেই প্রমাণিত হয় যে, ইবনে সীনাকে এর অন্তর্ভুক্ত করে তাকে হানাফী মাজহাবের অনুসারীরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। ইবনে সীনার রচনাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তার সমগ্র রচনার মধ্যে শুধু ৬৮টি গ্রন্থ ধর্ম সংক্রান্ত। হামদর্দ তিব্বীয়া কলেজ করাচির সাবেক অধ্যাপক খাজা বরজওয়ান আহমদ

www.pathagar.com

ইবনে সীনার 'আকীদা ও মাজহাব' সম্পর্কে লিখেছেন, 'তার রচনাবলী থেকে জানা যায় যে, তিনি শিয়া সুন্নীর বন্ধন থেকে মুক্ত ছিলেন এবং যখনই তাঁর প্রয়োজন হতো, সমস্যাগুলোর সমাধানে মস্তিষ্ক অস্থির হয়ে যেতো তখন তিনি বুখারার জামে মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করতেন, আবার চলে আসতেন। তিনি সেখানে শুয়ে পড়তেন অথবা মোরাকাবায় ধ্যান মগ্ন হতেন'। হাকীম রেজওয়ান এতদসংক্রান্ত ইবনে সীনার একটি পত্রের উল্লেখ করেন, যা তিনি ইবনে আবুল খায়ের সূফীকে লিখেছিলেন। এতে তার আকীদা-বিশ্বাসের সম্যক পরিচিতি পাওয়া যায়। চিঠিটির একটি উদ্ধৃতি এরূপ : 'বন্ধু আবু সাঈদ! তোমার জাহের-বাতেন, আউয়াল-আখের একমাত্র আল্লাহর দিকে হওয়া উচিত। ... আল্লাহ পাক পবিত্র এবং বে-আইব, দোষমুক্ত, যিনি গোপনে এবং প্রকাশ্যেও আছেন। তিনি প্রত্যেক বস্তুতে বিরাজমান জ্ঞানগতভাবে এবং তার নূর সকল বস্তুতে বিদ্যমান রয়েছে। যা এটা প্রমাণ করে যে, তিনি সর্বদা একক। তোমার জানা আবশ্যক যে, সকল কাজের মধ্যে নামায সর্বোত্তম, আর রোযা হচ্ছে সবচেয়ে আরামদায়ক। অনুরূপভাবে সদাকা সকল পুণ্যের অধিকতর উপকারী পুণ্য। রিয়া সকল কাজ বিনষ্টকারী এবং জ্ঞান শ্রেষ্ঠত্বের মূল আর মারেফাত হচ্ছে সব কিছুরই উর্ধ্বে...।

ইবনে সীনা একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। দার্শনিক মতবাদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, তার ঈমান নিয়ে বিভিন্ন সময় সন্দেহ পোষণ করা হয়েছে। কিন্তু তার সিরিয়াস রচনাসমূহের মাঝেও ধর্মীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ধর্মহীনতার অভিযোগ তার সময়েও উত্থাপিত হয়েছিল। এ ব্যাপারে ইবনে সীনা দুঃখ পেয়েছিলেন। লিখেছিলেন চতুষ্পদী নিম্নোক্ত কবিতা–

আমাকে কাফের বলা কখনো সহজ নয় অতো
ধর্মে আস্থা দৃঢ়তর, আমার আস্থার এই মতো।
ব্যক্তি বিশ্বে আমি অপরূপ, আমি যদি ধর্মহীন,
তাহলে কোথাও নেই একটিও মুসলিম মু'মিন।

ইবনে সীনা ইসলামের সাধারণ ইবাদতসমূহ নিষ্ঠাসহকারে পালন করতেন।

www.pathagar.com

কোন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক জটিলতার সমাধান করতে না পারলে তিনি প্রার্থনার জন্য মসজিদে ছুটে যেতেন। তিনি একজন উঁচু স্তরের আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন।

তার ধর্মচিন্তার মধ্যে সব সময় ঐক্য প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। শরীয়ত এবং প্রতিভার ব্যাপারে ইবনে সীনা শরীয়তের নিকটতর। তার সমগ্র দর্শন শেষ পর্যন্ত মিশেছে ধর্মতত্ত্বের সাথে।

তাওহীদ সম্পর্কে তার বক্তব্য ছিলো যৌক্তিক ও সাযুজ্যপূর্ণ। ইবনে সীনার বক্তব্য হলো, এক হতে অনেক হতে পারে কিন্তু অনেক হতে এক হতে পারে না। কারণ অনেকের মধ্যে কেউ আগে, কেউ পরে আসবে। এক পর্যায়ে যদি দু'টি সত্তারও আবির্ভাব হয় তার মধ্যেও একটি আগে ও অন্যটি পরে হবে। আর দু'টি যদি সমশক্তি সম্পন্ন হয় তবে দু'টোর সংঘাতে একটি কার্যকর এবং একটি অকার্যকর হয়ে পড়বে। এ ক্ষেত্রে এক সত্তাই সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করবে। তাই একত্ববাদের ধারণাই সঠিক।

ইবনে সীনার সামগ্রিক পরিচয় বিস্তৃত আলোচনার দাবী রাখে। বহুমুখী বিষয়ে তার অসামান্য মনীষার দ্যুতি ছড়িয়েছিল। তিনি একটি মহাজীবনের অধিকারী ছিলেন। জগৎ ইতিহাসের এই অসামান্য জ্ঞান সাধক ও বিজ্ঞানের যুবরাজ জ্ঞান অন্বেষণকারীদের জন্য ৬টি মূল্যবান উপদেশ রেখে গেছেন। পরিশেষে আমরা সেগুলোর উল্লেখ করছি–

১. এমন কিছু অন্বেষণ করো না, যা দ্বারা তুমি লজ্জিত বা অপমানিত হবে।

২. এমন কিছুতে বিশ্বাসী হয়ো না– যার দ্বারা তুমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩. হয় তুমি বিচক্ষণ বা মেধাবী হও, নতুবা শক্তিশালী হও। এর একটির অন্যথা হয়ো না।

৪. এমন কিছুর বিশ্বাসী হয়ো না– যার ফলে তুমি সাধারণ মানুষের দিকে ধাবিত হবে।

৫. নাস্তিক্য দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না।

৬. এমন কিছু অন্বেষণ করো– যা তোমাকে দেয়া হবে।

www.pathagar.com

ইউরোপীয় রেনেসাঁয় ইবনে সীনার প্রভাব

ইউরোপে রেনেসাঁর যুগে ইবনে সীনার বহু গ্রন্থ প্রথমে ল্যাটিন এবং পরে অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়। ৭১২ হতে ১০০৫ ঈসায়ী সন পর্যন্ত টলেডো মুসলমানদের অধীনে থাকায় এখানে যেমন প্রচুর আরবী গ্রন্থ জমা হয়েছিল, তেমনি এখানকার শিক্ষিত খ্রিস্টান, ইহূদীরাও আরবী ভাষায় বেশ লব্ধ হয়ে উঠেছিল। এ সুযোগে স্পেনের প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ রেমণ্ড (১১৩০ ঈসায়ী সন) আরবী গ্রন্থ ল্যাটিন অনুবাদের জন্য একটি অনুবাদ কেন্দ্র স্থাপন করেন। ইবনে সীনার 'কানুন' ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষায় অনূদিত হয়। তার বহু গ্রন্থ ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয় এবং ইউরোপীয় রেনেসাঁর দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। ইউরোপের পশ্চিম প্রান্তে স্পেনীয় মুসলমানদের সহায়তায় ঘুমন্ত ইউরোপ আস্তে আস্তে চোখ মেলতে শুরু করে। দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের প্রকৃত জাগরণ আসে। এ শতকেই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা শুরু হয়। ত্রয়োদশ শতকে তা আরো প্রবলতর হয়। একে J.J. Washk একে সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ বলতেও কুণ্ঠিত হননি। এখান থেকেই ধীরে ধীরে ইউরোপের আধিপত্য আরম্ভ হয়। তারা প্রাচ্যের এতদিনকার সযত্নে পোষিত ও বর্ধিত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে নিজের করায়ত্ত করে ফেলে এবং দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকে। ত্রয়োদশ শতকে ইউরোপে নতুন সভ্যতার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয়– আর এ বুনিয়াদের ভিত্তি ছিলো মুসলিম সভ্যতার উপর।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানী ও কবি ওমর ইবনুল খৈয়াম

'সুরা ও সাকী'র অমর কবি ও প্রতিভাধর বিজ্ঞানী ওমর খৈয়ামের নামের সাথে আমাদের কম-বেশি পরিচিতি আছে। তার পুরো নাম আবুল ফাতাহ ওমর ইবনে ইবরাহীম খৈয়াম। তবে তিনি 'ওমর খৈয়াম' নামে বেশি পরিচিত। জানা যায় তাঁর পিতা ইবরাহীম ছিলেন তাঁবু নির্মাতা। আরবীতে খিমা অর্থ তাঁবু। আর তাঁবু নির্মাতাকে বলা হয় 'খৈয়াম'। এ সূত্রে তিনি খৈয়াম নামে পরিচিতি লাভ করেন অনেকটা পৈতৃক কারণে। তবে জনৈক ইংরেজ গবেষক খৈয়াম শব্দ দ্বারা ছন্দ নির্মাণে কুশলী কবি বুঝাতে চেয়েছেন। ওমর খৈয়াম যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে সত্য উদঘাটন করতেন বলে তাঁকে 'হুজ্জাতুল হক' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

বিজ্ঞানী ও কবি ওমর খৈয়াম ইরানের খুরাসান রাজ্যের বিখ্যাত 'নিশাপুরে' জন্মগ্রহণ করেন ঈসায়ী ১০৩৯ সনে। তবে বলে রাখা ভালো যে, তার জন্ম মৃত্যু নিয়ে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। তেমনি মতভেদ আছে তার জীবনকাল নিয়ে।

নিশাপুর ঐতিহ্যবাহী শিক্ষার কেন্দ্রভূমি ছিলো বহুকাল ধরেই। ওমর খৈয়াম তার শৈশব শিক্ষা এখানেই লাভ করেন। তিনি মুয়াফ্‌ফাকুদ্দীন নামক বিদগ্ধ অধ্যাপকের কাছে কুরআন, হাদীস, ফিকাহ বিষয়ে দীর্ঘ ৪ কিংবা ৬ বছর শিক্ষা লাভ করেন। এছাড়া তিনি নিশাপুরেই গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন সাহিত্য, গ্রীকভাষা এবং দর্শন বিজ্ঞানের বিস্তৃত শাখায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তার সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন 'তুস' হতে আগত নিযামুদ্দীন আল তুসী- যিনি পরবর্তীতে সেলজুকী রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। দ্বিতীয় জন ছিলেন বিভ্রান্ত ধর্মবোধে বিশ্বাসী হাসাম ইবনে সাব্বাহ- যিনি বাতেনী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং তার সন্ত্রাসীদের হাতে নিজামুল মুলুক তুসীকেও প্রাণ দিতে হয়েছে। আর তৃতীয় জন খৈয়াম নিজে। তিনজনই পরবর্তীতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিচিত ও বিখ্যাত হয়েছিলেন।

দীর্ঘ ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত ওমর খৈয়াম লেখা-পড়া চালিয়ে যান। তিনি মূলত

www.pathagar.com

একজন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী, গাণিতিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং দার্শনিক ছিলেন। জানা যায়, অধ্যাপনা দিয়েই তার কর্মজীবনের শুরু। তিনি খুরাসান ও ইরানের বিভিন্ন এলাকায় গণিত, দর্শনসহ বিভিন্ন শাস্ত্রের উপর গবেষণা ও শিক্ষা দিতে থাকেন। মহান দার্শনিক ইবনে সীনার একজন গভীর অনুরাগী ছিলেন তিনি। সমসাময়িক মনীষী জহির উদ্দীন বায়হাকী বলেন, 'ওমর খৈয়াম ইবনে সীনার সমকক্ষ দার্শনিক ছিলেন। তিনি সেলজুক সুলতান জালালুদ্দীন মালিক শাহের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন শাসক এবং আমীরের শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন ওমর।'

সুলতান মালিক শাহ সেলজুরী (৪৬৫-৪৮৮ হি.) মানমন্দির নির্মাণের জন্য তাকে আহ্বান জানান। দীর্ঘ ৫ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে তিনিই সর্বপ্রথম সৌরপঞ্জিকা আবিষ্কার করেন। এতে তাকে সহায়তা করেছিলেন ৭ জন সহকারী বিজ্ঞানী। খৈয়ামের আবিষ্কৃত এ সৌর সাল সুলতান জালালুদ্দীনের নামে 'জালালী ক্যালেণ্ডার' নামে পরিচিতি লাভ করে। ঐ বৈজ্ঞানিক সাফল্যের জন্য ওমর প্রচুর পুরস্কার ও সম্মান লাভ করেছিলেন। দুঃখের বিষয়, বর্ণচোরা পাশ্চাত্য সৌর ক্যালেণ্ডার তাদের আবিষ্কৃত বলে প্রচার করে থাকে। অথচ তার পুরো কৃতিত্বটা বিজ্ঞানী জ্যোতির্বিদ ওমর খৈয়ামের। ঐতিহাসিক HITTI বলেন– The researches of Umar al khayyam and his collaborators resulted in the production of the calender named after his patron at Tarikh al-jalali, which is even more accurate then the Gregorian Calender. The Later leads to an error of one day in 3330 years, where as al-Khayyam's apparently leads to an error of one day in 5000 years.

সৌর বছরের যে পরিমাণের উপর তিনি গবেষণা করেন তাতে এবং বর্তমান প্রচলিত গণনায় মাত্র ৩ মিনিট ১১ বা ১৭ সেকেণ্ডের পার্থক্য।

ওমর খৈয়াম জ্যোতির্বিদ এবং গাণিতিক হিসেবে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তার 'আল জাবর' বীজগণিত গ্রন্থ বিশ্ববিখ্যাত। গণিত ও বীজগণিতে তার অবদান অবিস্মরণীয়। বীজগণিত বিষয়ক তার গ্রন্থটি মোট ১০ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ৬টি বিষয় বিন্যাসে সমাপ্ত। এতে রয়েছে–

www.pathagar.com

১. বীজগণিতের সংজ্ঞাসমূহের ব্যাখ্যাসহ ভূমিকা।

২. সরল ও যৌগিক সমীকরণসহ যে সকল সমীকরণ সমাধান করা হয়েছে, সেগুলোর তালিকা।

৩. প্রথম দ্বিতীয় মাত্রা সমীকরণের গাণিতিক ও জ্যামিতিক সমাধান।

৪. ভগ্নাংশীয় সমীকরণ সম্পর্কে আলোচনা।

৫. বিজ্ঞানী আবুল জুদের কার্যাবলী আলোচনা।

খৈয়ামের আল জাবর গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি লিডেন, প্যারিস ও ইণ্ডিয়া লাইব্রেরিতে বর্তমানে রয়েছে।

ওমর খৈয়াম ২১টি সরল সমীকরণ, ১৪টি ত্রিরাশিক ত্রিমাত্রিক সমীকরণ, ২৪টি ত্রিরাশিক চতুর্মাত্রিক সমীকরণ (three terms including an interval of any four successive degree) এবং ২৮টি চতুর্রাশিক চতুর্মাত্রিক সমীকরণ অর্থাৎ মোট ৮৮টি সমীকরণের উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে ২টি বাদে ৮৬টি সমীকরণের সমাধান তার নিয়মে করা যেতে পারে। বাকী দু'টির জন্য ইবনুল হাইছামের auxiliary proposition এর দরকার। উল্লেখ্য এসব সমীকরণের মাত্র ৬টি পূর্বসূরি বিজ্ঞানীগণ আলোকপাত করেছিলেন। তার ত্রিমাত্রিক সমীকরণের সমাধান সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন মসিয়ে উপেক তার L' Algebra d' Omar গ্রন্থে।

বীজগণিতের একটি বিশেষ শাখা হলো Binominal theorem. দু'টি সংখ্যার যোগফল যে কোন শক্তিমাত্রায় উন্নীত হলে সংখ্যাসমূহের গুণক নির্ধারণ করার একটি সহজ পন্থা। অঙ্কের পরিভাষায় একে বলা হয় (a+b), n:n যে কোন সংখ্যা হোক না কেন বড় ধরনের ঝুঁকি ও ঝামেলার আশ্রয় না নিয়ে a ও b এর গুণক বের করা। গ্রীক বিজ্ঞানী ইউক্লিড এক্ষেত্রে শুধুমাত্র সাধারণ দ্বিশক্তির আলোচনা করেছেন। এর বেশি মাথা খাটাননি। ওমর খৈয়াম সর্বপ্রথম এ নিয়ে সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ করেন। তিনি উক্ত গুণক নির্ধারণ করার পদ্ধতি বের করেন Binominal theorem এর আবিষ্কর্তা হিসেবে বিজ্ঞানী নিউটনের নাম চালানো হয়, কিন্তু প্রধান আবিষ্কারক ওমর খৈয়ামের নাম আরো অনেক মুসলিম বিজ্ঞানীর মতো ভাগ্য বরণ করে। আল জিজ, মুশকিলাতে হিসাব প্রভৃতি তার গণিত বিষয়ক গ্রন্থ।

www.pathagar.com

তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন। এক শ্রেণীর গবেষকদের মতে, তিনি গ্রীক ভাষা শিক্ষা দিতেন বলে সাধারণ কিছু মানুষ তাকে বিভ্রান্ত মনে করতো, এমনকি হত্যার প্রচেষ্টাও চালায়। তখন তিনি হজ্জে মক্কায় চলে যান।

ওমর ইবনুল খৈয়াম দর্শন, চিকিৎসা শাস্ত্র, প্রকৃতি বিজ্ঞান, রসায়ন এবং ভূগোল শাস্ত্রেও মৌলিক অবদান রেখেছেন।

অভিজ্ঞ ফার্সী ভাষাবিদ ছিলেন তিনি। ছিলেন এক উঁচু স্তরের কবি। তার কবিতা খ্যাতি লাভ করেছে খুব বেশি দিন হয়নি। স্বয়ং তার দেশ ইরানে তার এ দিকটি অজানা ছিলো। তিনি কঠোর বিজ্ঞান সাধনার পাশাপাশি মাঝে মাঝে কিছু চার ছত্রের রুবাই রচনা করেছেন। ফার্সী কবিতা রচনার সময় তিনি কবি নাম হিসেবে 'তাখাল্লুস ওমর খৈয়াম' লিখতেন। এ কবিতাগুলো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বিরাট সমাদর লাভ করেছে এবং বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এগুলো ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাসে তার স্থানকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নিজে একজন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ ছিলেন বলে তার কবিতায় বিজ্ঞান বিষয়ক শব্দ, উপমা ও চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয়েছে। ওমর খৈয়ামের কবিতা খ্যাতি পায় ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে বহির্বিশ্বে। কবি ফিটজিরাল্ড তার অনুবাদ করে তাকে বিশ্বনন্দিত কবি হিসেবে উপস্থিত করেন। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামও তার বেশ কিছু রুবাই কাব্যানুবাদ করেছেন বাংলায়। এছাড়াও অন্যান্য আরো বহু অনুবাদ হয়েছে।

আগেই উল্লেখ করেছি ওমর খৈয়াম সৌর ক্যালেণ্ডারের প্রথম আবিষ্কারক। তিনিই প্রথম সরকারের দ্বারা এ নীতির স্বীকৃতি লাভ করেন যে, ধর্মীয় ব্যাপারে যেমন হজ্জ, ঈদ, রমাযান ইত্যাদির সময় নির্ণয়ে চান্দ্র হিসাব ও জালালী ক্যালেণ্ডার অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ব্যাপারগুলোতে যেমন– রাজস্ব আদায়, বেতন পরিশোধ সৌর ও ইরানী ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী সময় অনুসৃত হবে। ওমর খৈয়াম সৌর বছরকে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট গণ্য করেছিলেন। তাই সৌর পঞ্জিকানুযায়ী ৩৬৫

www.pathagar.com

দিন এবং পূর্ণ ৬ ঘণ্টা হিসাব করে প্রতি তৃতীয় বছরে লিপইয়ার এর একদিন বৃদ্ধি করা হয়। এতে যেহেতু ঘণ্টাগুলোর বৃদ্ধি পূর্ণ ৬ ঘণ্টার পরিবর্তে ৫ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট হয় তাই চতুর্থ বছর ১ দিন বৃদ্ধি করায় চার বছরে ৪৪ মিনিট বেশি হয়। তিনি এ অতিরিক্ততা নিরসন করেন যে, ১৩২তম বছরকে লিপইয়ার বর্ষ ধরা হবে না। এভাবে যে বছর ১৩২ দিনে পূর্ণ বিভক্ত হবে সেটিকেও লিপইয়ার বর্ষ গণ্য করা হবে না। তার এ পদ্ধতি অনুযায়ী ৩৭৭০ বছরে ১ দিনের পার্থক্য ঘটবে।

বিজ্ঞানী ও কবি ওমর খৈয়ামের মৃত্যু নিয়ে মতভেদ আছে। কারো মতে তার বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। আবার ১৯৫০ সালে ইরান অনুমোদিত তার গ্রন্থে জীবনকাল দেখানো হয়েছে ১০৬ বছর। সে যাই হোক, এক বর্ণনানুযায়ী মৃত্যুর ১২ দিন পূর্বে তিনি বিশ্ববিশ্রুত হাদীস গ্রন্থ 'বুখারী শরীফের' সংকলক ইমাম বুখারীর (রহ) মাজারে অবস্থান করছিলেন এবং সেখানেই ৫০৫ মতান্তরে ৫১৭ হিজরীতে ৭ই রজব ইন্তেকাল করেন। কিছু জীবনীকার ই.জি ব্রাউন এর মত অনুসরণ করে বলেন, তিনি ১১৩৫-৩৬ ঈসায়ী সালে ইন্তেকাল করেছিলেন।

www.pathagar.com

ইবনে নাফিস : ফুসফুসে রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতির আবিষ্কারক

মুসলিম বিশ্বে বিজ্ঞানী হিসেবে ইবনে সীনার যে খ্যাতি তা অন্য কারো ক্ষেত্রে নয়। তবে ইবনে নাফিস সেই স্মরণীয় বিজ্ঞানী ও অসাধারণ বহুমুখী প্রতিভার মনীষী ছিলেন যাকে প্রকৃত অর্থেই 'দ্বিতীয় ইবনে সীনা' বলা যায়। তিনি ছিলেন তার যুগের চেয়ে কয়েক শতাব্দী এগিয়ে। তার দুঃসাহসী বৈজ্ঞানিক মতামত সেটাই প্রমাণ করে। রক্ত চলাচল সম্পর্কে তার মতবাদ ও ফুসফুসের গঠনতন্ত্র আবিষ্কারে তার অবদান আজও বিজ্ঞানজগৎ সুবিবেচনা করতে পারেনি।

ইবনে নাফিসের পুরো নাম আলাউদ্দিন আবুল আলা আলী ইবনে আবিল হারাম ইবনিল নাফিস আল কুরাইশী আদ দামিস্কী। তিনি ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে দামেস্কে জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ তার জন্মস্থান মিসর বলে উল্লেখ করেছেন।

দামেস্কের চিকিৎসক মুহায়জিব উদ্দীনের অধীনে তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। তার শিক্ষকের সংখ্যা আরো অনেক। চিকিৎসাবিদ্যা ছাড়াও তিনি ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা, ফিকাহ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন।

ইবনে নাফিস এক সময় কায়রোর প্রধান চিকিৎসক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সুলতান প্রথম বায়বারস এর ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। নাসিরিয়া হাসপাতালে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিভাবান ছাত্রকে তিনি চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন। চিকিৎসা খ্যাতি তাকে বিপুল বিত্তের মালিক করেছিল। তিনি অকৃতদার ছিলেন। কায়রোতে তার জন্য নির্মিত হয় একটি বিলাসবহুল প্রাসাদ।

১২৮৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী ইবনে নাফিস কায়রোতে ইন্তেকাল করেন। তার প্রাসাদ, বিশাল সম্পত্তি ও মূল্যবান গ্রন্থরাজি সুলতান আলাউদ্দীন প্রতিষ্ঠিত (১২৮৪) মনসুরী হাসপাতালে তিনি দান করে যান।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানী ইবনে নাফিসের জীবনচরণ সম্পর্কে খুব বেশি জানা যায় না। তার সমসাময়িক আর এক চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনে আবী উসাইবিয়া এক বিরাট সংখ্যক মুসলিম স্কলারদের জীবনী লিখে খ্যাতি অর্জন করলেও সম্ভবত ঈর্ষাবশত তাকে বাদ দিয়েছেন। অথচ মহাকাল ইবনে নাফিসকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিজ্ঞ আছির উদ্দীন আবু হাইয়ান (১২৫৬-১৩৪৫), ইবনে নাফিস সম্পর্কে বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত কিছু তথ্য সরবরাহ করেছেন। তিনি লিখেছেন, ইবনে নাফিস দামেস্কে প্রথম জীবন অতিবাহিত করেন। মিসরে গমন তার জীবনে খ্যাতি ও প্রাচুর্য এনে দেয়। সেখানে তিনি চিকিৎসাবিদ্যা ও ছাত্রদের ফিকাহ্ পড়াতেন।

ইবনে নাফিস লিখতে বসলে অনেকগুলো কলম ঠিক করে সামনে রাখতে হতো। তিনি দেয়ালের দিকে মুখ করে বসে কোন কিছু না দেখেই লেখা শুরু করতেন। নীচের দিকে প্রবলবেগে বয়ে যাওয়া স্রোতধারার মতো তিনি লিখে যেতেন। কলম ভোতা হয়ে গেলে অন্য একটি নিয়ে লেখা শুরু করতেন। একদিন তিনি গোসল করছিলেন। হঠাৎ অর্ধেক গোসল শেষ করে খৌর ঘরে গিয়ে কলম চাইলেন এবং সেখানে লিখে ফেললেন নাড়ী সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ। এরপর গোসল খানায় আবার গিয়ে গোসল শেষ করলেন।

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তার লেখা অনেক গ্রন্থ রয়েছে। এর মধ্যে প্রাচীন গ্রীক ও মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের গ্রন্থের ভাষ্য, নিজস্ব গবেষণা ও মতবাদ বিষয়ক রচনা রয়েছে। তিনি বাস্তব চিকিৎসা অপেক্ষা তত্ত্ব উপস্থাপনেই অধিক আগ্রহী ছিলেন। Encyclopaedia of Islam লিখেছে, ...the range and depth of his general culture are impressive, the literay activity of Ibn al-Nafis was important and extensive. He was mainly a common-tator but one on independent mind and very extensive knowledge. He is said to have written most of his works out of his head without reference to books, which seems to be confirmed by the fact that as a rule they contain as far as they are not commentaries, very few references to earliar works.

www.pathagar.com

অর্থাৎ তার শিক্ষা ও জ্ঞানের গভীরতা সকলের মনেই রেখাপাত করতো। ইবনে নাফিসের সাহিত্যকর্ম প্রচুর এবং গুরুত্বপূর্ণ। তিনি প্রধানত একজন টীকাকার হলেও স্বাধীন চিন্তা ও ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি নিজস্ব ধ্যান ধারণা থেকে লিখতেন, অন্যের ধ্যান ধারণা ও চিন্তা তিনি ধার করেননি। তার শক্তি-শালী প্রমাণ এটাই যে, তার ভাষ্য ও টীকামূলক রচনা ব্যতীত অন্যান্য লেখায় পূর্ববর্তী গ্রন্থকারদের গ্রন্থ থেকে তার কোন উদ্ধৃতি বা উল্লেখ নেই বললেই চলে।

বিজ্ঞান জগতে যে কারণে ইবনে নাফিস চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন, তা হলো রক্ত চলাচল সম্পর্কে তৎকালীন প্রচলিত মতবাদের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ এবং এ সম্পর্কে নিজের নতুন মতবাদের প্রকাশ। আরব চিকিৎসা বিজ্ঞান তখন প্যালেসের মতবাদকে স্বর্গীয় বাণীর মতো অভ্রান্ত মনে করতো, তার মতবাদের বিরুদ্ধে কথা বলার সৎসাহস ও যোগ্যতা থাকলেও তা প্রকাশে কেউ এগিয়ে আসতো না। এভাবে গ্যালেনের পর মহাবিজ্ঞানী ইবনে সীনার মতবাদসমূহও বিজ্ঞান জগতে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলো না। এই সময়ের ইবনে নাফিস উক্ত দুই বিজ্ঞানীর মতামতের পাশাপাশি নিজের মত জোরালোভাবে প্রকাশ করেন।

ইবনে সীনার চিকিৎসা বিশ্বকোষ আল কানুনের এনাটমী অংশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইবনে নাফিস লিখেন 'শারহু তাশবীহি কানুন লি ইবনি সীনা'। এ গ্রন্থেই তিনি রক্ত চলাচল সম্পর্কে দুঃসাহসী মতবাদের বিষয় খণ্ডন করে নতুন মতবাদ প্রচার করেন। এটি physiology'র খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি রচনা ও মতবাদ। এতে তিনি হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের ভেতর দিয়ে রক্ত চলাচল সম্পর্কে গ্যালেন ও ইবনে সীনার মতবাদের উল্লেখপূর্বক তা ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেন।

কানুনের বিভিন্ন অংশের উদ্ধৃতি আলোচনাপূর্বক তিনি লিখেছেন হৃৎপিণ্ডের অন্যতম কাজ হলো জীবনে তেজ উৎপন্ন করা। আর এ জীবন তেজ হলো পরিশোধিত রক্ত এবং বায়বীয় পদার্থের সংমিশ্রণ। সে জন্য হৃৎপিণ্ডের অতি পরিষ্কৃত রক্ত ও বাতাসের প্রয়োজন, যাতে এ দুইয়ের সংমিশ্রণে জীবনে তেজ

www.pathagar.com

উৎপন্ন হতে পারে, হৃৎপিণ্ডের বাম প্রকোষ্ঠে এই সৃষ্টির কাজ হয়। মানুষ ও প্রাণী যাদের ফুসফুস আছে তাদের হৃৎপিণ্ডে আরও একটি প্রকোষ্ঠ থাকা দরকার যাতে রক্ত পরিষ্করণের কাজ চলতে পারে এবং পরিষ্কৃত রক্ত বাতাসের সাথে মিলতে পারে। কেননা বাতাস যদি ভারী রক্তের সাথে মিশ্রিত হয় তাহলে তা হতে এক রকমের পদার্থ উৎপাদন করা সম্ভব নয়। এই প্রকোষ্ঠটি হল ডান প্রকোষ্ঠ। ডান দিকের প্রকোষ্ঠ হতে রক্ত পরিশোধিত হয়ে বাম প্রকোষ্ঠ যাওয়া দরকার, যেখান হতে উৎপন্ন হয় জীবন তেজ। কিন্তু এ দু'টির মধ্যে চলাচলের কোন পথ নেই কিংবা যে অদৃশ্য চলাচলের কথা বলেছেন তেমন কোনও পথ ও নেই। আসলে ব্যাপারটি অনুরূপ। হৃৎপিণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সবই বন্ধ এবং এর পদার্থগুলোও বেশ পুরু। তাই রক্ত পরিশোধিত হয়ে ফুসফুস ধমনীর মধ্য দিয়ে ফুসফুসে পৌঁছায়। তাতেই ফুসফুসের আয়তন বাড়ে, যেন পরিশোধিত রক্ত বাতাসের সাথে মিশে বিন্দু পর্যন্ত করার ক্ষমতা অর্জন করে। রক্তের যে অংশ ভালোভাবে পরিশোধিত হয় না, তা ফুসফুসে থেকে তার পুষ্টি যোগায়। ফুসফুস শিরায় রয়েছে কঠিন পদার্থের দুইটি স্তর, যাতে এর মধ্যে প্রবাহিত রক্ত আরো বিশুদ্ধভাবে পরিশোধিত হয়। ফুসফুস ধমনীতে অন্য পাশে রয়েছে পাতলা পদার্থ, যাতে শিরার মধ্যে রক্ত প্রবাহিত হয়ে আসতে পারে। এজন্য দুইটি রক্তকোষের অর্থাৎ ফুসফুস শিরা এবং শিরার মধ্যে চলাচলের পথ রয়েছে। তার মতে, ফুসফুস ধমনী মহাধমনী (Arts) অপেক্ষা ছোট। কেননা শিরায় থাকে অল্প পরিমাণ রক্ত আর মহাধমনীতে থাকে সেই রক্ত ও বাতাসের সংমিশ্রণ।

এরিস্টটলের অনুসরণে ইবনে সীনা হৃৎপিণ্ডে ৩টি প্রকোষ্ঠের কথা উল্লেখ করেছিলেন। ইবনে নাফিস তা নাকচ করে দেন। হৃৎপিণ্ডে মাত্র দুইটি প্রকোষ্ঠ আছে। ডান দিকেরটা রক্তে পরিপূর্ণ থাকে আর বাম দিকেরটিতে থাকে জীবন। এই দুইয়ের মধ্যে চলাচলের কোন পথ নেই, তা থাকলে জীবন তেজের জায়গায় রক্ত প্রবাহিত হয়ে জীবন তেজকে নষ্ট করে ফেলত। পূর্ববর্তী মনীষীদের এ বিষয়ক মতবাদ ছিলো পুরোপুরি ভুল। আসলে দুই হৃৎ প্রকোষ্ঠের পর্দা (Septum) অন্য স্থানের তুলনায় বেশি ঘন জিনিস ভর্তি যাতে রক্ত বা জীবন তেজ-এর মধ্য দিয়ে চলাচল করতে না পারে।

www.pathagar.com

এরিস্টটলের মতে, দেহের পরিমাপ অনুসারে হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠের সংখ্যা কম বেশি হয়। ইবনে নাফিস তাও ভুল প্রমাণ করেন প্রকৃতপক্ষে রক্ত ডান দিকের প্রকোষ্ঠ হতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং ফুসফুসের মধ্য দিয়ে বাম হৃৎ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে।

ইবনে নাফিসের এ যুগান্তকারী আবিষ্কার আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু ছয় শতাব্দী ধরে তার এই মতবাদ সম্পর্কে আমাদেরকে অন্ধকারে রাখা হয়। বর্তমানে এই গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ আবিষ্কারক হিসেবে সম্মান দেয়া হয় সতর শতকের বিশিষ্ট ইংলিশ চিকিৎসাবিদ উইলিয়াস হার্ভে কে (William Harvey) (১৫৬৮-১৬৫৭)। অথচ হার্ভের জন্মের ৩০০ বছর পূর্বে আরব বিজ্ঞানী ইবনে নাফিস এই থিওরি বিশ্বকে দিয়ে যান। বিংশ শতাব্দীর আগে কেউ এ ব্যাপারে জানতেও পারেনি।

মিসরের বিশিষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানী ১৯২৪ সালে তার ডক্টরেট অভিসন্দর্ভে ইবনে নাফিসের উক্ত আবিষ্কারের কথা তুলে ধরেন। তার সূত্র ধরে Max Meyerhof এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে গিয়ে ইবনে নাফিসের লিখিত গ্রন্থের অনুবাদ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রথম স্বীকৃতি লাভ করে।

উইলিয়াম হার্ভে, মাইকেল সার্ভিটাস এবং রিয়াল্ড কলম্বো পনের ষোল শতকের রক্ত চলাচল যে মতবাদ প্রকাশ করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন বিশেষজ্ঞদের ধারণা তারা তা ইবনে নাফিসের রচনা হতে পেয়েছেন কিন্তু তার ঋণ স্বীকারে যথেষ্ট কৃপণতা প্রকাশ করেছেন। মাইকেল সার্ভিটাস যখন এ মতবাদ প্রচার করেন তখন খ্রিস্টীয় সমাজে এ বক্তব্যে ধর্ম বিরোধী বলে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়। উল্লেখ্য সার্ভিটাস ছিলেন পূর্ব স্পেনের একজন পাদ্রী চিকিৎসক। এখানে তার জন্মের কিছুকাল আগেও মুসলিম শাসন বলবৎ ছিলো। আরবী গ্রন্থের অনুবাদ চর্চায় আলফান্সো অবসানের পরও সে সময়েই বোধ হয় তিনি ইবনে নাফিসের রচনার সাথে পরিচিত হন। এছাড়া তার মতবাদ উল্লেখ করতে তিনি যে পরিভাষা ব্যবহার করেছেন তা ইবনে নাফিসের অনুরূপ। সার্ভিটাস সম্ভবত কোন ল্যাটিন অনুবাদের মাধ্যমেই উক্ত মতবাদ সম্পর্কে প্রথম জানতে পারেন। যা– হোক রক্ত সঞ্চালন মতবাদ প্রকাশ করে তিনি কিন্তু বাঁচতে পারেননি, ১৫৫৩ সালে খ্রিস্টান সমাজে প্রবল

www.pathagar.com

প্রতিক্রিয়া হলে বিচারে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় এবং জীবন্ত পুড়িয়ে তাকে হত্যা করা হয়।

১৬১৮ সালে উইলিয়াম হার্ভে যখন এ মতবাদ প্রথম জনসমক্ষে আনেন, সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ায় তিনিও ভীত ছিলেন। কিন্তু প্রোটেস্টান্ট রাজ দরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি রক্ষা পান। তবে জনসমাজে তার জনপ্রিয়তা ও প্রভাব গিয়ে ঠেকে শূন্যের কোঠায়। তার আয় কমে যায় এবং লোকে তাকে পাগল বলে অভিহিত করে।

এ সকল ঘটনায় আমরা অনুমান করতে পারি ইবনে নাফিস তাদের শত শত বছর আগেই কী দুঃসাহসী কাজটাই না করেছিলেন।

ইবনে নাফিস কর্তৃক রচিত প্রায় বাইশটি গ্রন্থের নাম জানা যায়। সমসাময়িককালে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন 'আল মুজিজ ফিত্‌তীব' গ্রন্থটির জন্য। এটি ছিলো ইবনে সীনার কানুনের সংক্ষিপ্ত সার। সমগ্র বিশ্বে এ গ্রন্থটি বহুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। অনেকেই এর ভাষ্য লিখেন এবং বহু ভাষায় এটি অনূদিত হয়। কেবল ভারতবর্ষে ১৮২৮ থেকে ১৯০৬ সালের মধ্যে অন্তত ৬ বার এটির লিখোগ্রাফ মুদ্রিত হয়।

কিতাবুল শামিল ফিত্‌তীব ঔষধ বিষয়ক একটি বৃহৎ রচনা। ৩০০ খণ্ডে সমাপ্তের ইচ্ছা থাকলেও ইবনে নাফিস-এর ৮০টি খণ্ড রচনা করে যেতে সক্ষম হন। গ্রন্থটি যদি পূর্ণতা পেত তাহলে তা চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্ববৃহত্তম বিশ্বকোষে রূপ নিত। এ গ্রন্থের প্রাপ্ত ৩টি খণ্ড ক্যালিফোর্নিয়ার স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির মেডিকেল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে।

ইবনে সীনার কানুনের ব্যাখ্যা নিয়ে তিনি আরো কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে কয়েক খণ্ডের 'শারহুল কানুন' একটি মূল্যবান ভাষ্য। তুরস্কের আয়াসোফিয়া মিউজিয়ামে এর কয়েকটি পাণ্ডুলিপি বর্তমান রয়েছে। ইউরোপের রেনেসাঁ যুগের চিকিৎসাবিদ আন্দ্রে আলপাগো-এর ভাষ্যের একটি অংশ ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন, যা ১৫৪৭ সালে ভেনিসে প্রকাশিত হয়।

'কিতাবুল মুহাজ্জাব ফি তিব্বুল আইন' চক্ষুতত্ত্ব বিষয়ে ইবনে নাফিসের রচিত

www.pathagar.com

একটি গ্রন্থ। এতে তিনি চক্ষুতত্ত্ব, মানুষ ও জীবজন্তুর চক্ষুর পার্থক্য, দৃষ্টি, চোখের নানা রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা, ঔষধের ব্যবহার ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটি সর্বদিক দিয়ে একটি নতুন ও চিত্তাকর্ষক রচনা। মুসলিম দুনিয়ায় চক্ষু বিষয়ের গ্রন্থের এটিই সর্বাপেক্ষা বিশদ ও সম্পূর্ণ। চক্ষু ও চক্ষুরোগের চিকিৎসা এতে কিছু মৌলিক ধ্যান ধারণা ব্যক্ত করেছেন তিনি। গ্রন্থটির অন্তত ৩টি পাণ্ডুলিপি বর্তমান আছে বার্লিন গ্রন্থাগারে। তার রচিত চিকিৎসা ও অন্যান্য রচনাবলীর মধ্যে আরো রয়েছে–

১. কিতাবুল মুখতার মিনাল আগজিয়া ঃ খাদ্য বস্তুর পছন্দ-অপছন্দ বিষয়ে রচিত। বার্লিনে সরকারী লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত।

২. রিসালা মানফিইল আদাল ইনসানিয়াত : মানুষের দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাজ বিষয়ে রচিত। কায়রোতে রক্ষিত।

৩. শারহে ফুলুসি আবকুরাত : এটি হিপোক্রেটসের গ্রন্থের ব্যাখ্যা।

৪. শারহে তাকদিমাতিল মারিফা লি আবকুরাত ফিত্‌তীব : হিপোক্রেটসের গ্রন্থের ভাষ্য।

৫. কিতাবুল মুহাজজিব ফিল কুহল : চক্ষুরোগ বিষয়ে বিশদ গ্রন্থ।

৬. তারীকুল ফায়াহা : বাগ্মিতা ও ব্যায়াম বিষয়ক গ্রন্থ।

৭. মুখতাসারুল মানাতিক : যুক্তিবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ।

৮. আর রিসালাতুল কামালিয়া ফিস সীরাতিন নাবাবিয়া : এ গ্রন্থটি ইবনে নাফিসের বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যালোচনা বিষয়ক একটি রচনা। এছাড়া তিনি কয়েকটি শরাহ তথা ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন চিকিৎসা, ভাষাতত্ত্ব, ও আইন বিষয়ক গ্রন্থের। তবে তার রক্ত চলাচল বিষয়ে সূত্রের আবিষ্কার তাকে বিজ্ঞান জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে।

www.pathagar.com

দার্শনিক ও বিজ্ঞানী আল ফারাবী

আজকের বিশ্বে যে সকল বিজ্ঞানী, শিল্পী, সাহিত্যিক ও গুণিজনেরা তাদের স্ব স্ব অবদানের জন্য স্মরণীয় ও বরণীয় হন, তাদের নিয়ে সর্বত্র দেখা যায় বড় তোড়জোড়। তার প্রতিভার বিস্ময়তা, সৃষ্টির বিশালতা ও উদ্ভাবনার উন্মাদনাকে নানাভাবে স্বাগত জানানো হয়, দেয়া হয় বড় বড় পুরস্কার। নোবেল প্রাইজ একটা বড় পুরস্কার। প্রতিবছর বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য এ পুরস্কার দেয়া হয়। যদিও এই পুরস্কারের ব্যাপারে নানা মত আছে তবুও বর্তমান বিশ্বে এর খ্যাতির কথা অস্বীকার করা যায় না। কোন ব্যক্তি সাহিত্য, শিল্প, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, সেবা ইত্যাদির কোন একটিতে ভালো কিছু করার উৎসাহ ও প্রেরণাস্বরূপ এ পুরস্কার দেয়া হয়। কিন্তু দেখা যায় এসকল সম্বর্ধিতজনের কারো মাঝে একাধিক গুণের কৃতিত্বের সমুজ্জ্বল প্রতিফলন নেই; অথচ ইতিহাস আমাদের এ তথ্য সরবরাহ করেছে যে, বিগত মুসলিম মনীষীরা প্রত্যেকেই জ্ঞানের একাধিক বিষয়ের উপর স্মরণীয় অবদান রেখেছেন। মনে হয় এমন কোন মুসলিম বিজ্ঞানী নেই যার মধ্যে এক সঙ্গে কয়েকটি প্রতিভার আলোকবর্তিকা জ্বলে উঠেনি। এমনকি বিজ্ঞানের পৃথক অসংখ্য শাখায় তাদের যাদুর স্পর্শ ছিলো। অনুসারী বা অনুকরণীয় না হয়ে তারা ছিলেন মৌলিক ও যুগান্তকারী বিষয়সমূহের উদ্‌গাতা।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অসংখ্য আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মধ্যে এটাও অন্যতম যে, বিশ্ব সভ্যতায় তাদের অবিস্মরণীয় অবদানকে ধামাচাপা দেয়ার নানা কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে। এমনকি তাদের অনেকেরই বড় বড় আবিষ্কার ও মূল্যবান গ্রন্থসমূহ ইউরোপীয়দের বলে চালানো হচ্ছে। এখনো, এ রেনেসাঁর যুগেও এমন অসংখ্য ঘটনা আমাদের গোচরে আসেনি কারণ জ্ঞান চর্চা ও গবেষণার উত্তরাধিকার যে মুসলমানদের তারা তাদের সেই ময়দান ছেড়েছে আর শূন্য স্থানগুলো লুফে নিয়েছে ইউরোপ।

মুসলিম মনীষী আল ফারাবী এক অনন্য সাধারণ মহাদার্শনিক, ভাষাবিদ ও বিজ্ঞানী। তার পুরো নাম আবু নাছের আল ফারাবী। যিনি তৎকালীন দুনিয়ার

www.pathagar.com

৭০টি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন। একমাত্র ভাষা বিজ্ঞানী হিসেবেই যদি তার প্রতিভার বিচার করা হয় তাহলে বলতে হয়, এরকম বহু ভাষাবিদ তার সময়কার পৃথিবীতে ছিলেন কিনা বা বর্তমানে আছে কিনা তার খোঁজ নেয়া বড় দুর্লভ ব্যাপার। উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ ও পণ্ডিত ছিলেন তাপস ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। যিনি প্রায় ২৫টি ভাষা জানতেন। জ্ঞান তাপস হিসেবে তিনি সবার কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়। শুধু এদিক থেকে প্রায় তিনগুণ ভাষা জ্ঞানের অধিকারী আল ফারাবী। তাহলে তিনি মুসলমানদের কতটুকু শ্রদ্ধার যোগ্য।

আল ফারাবী জন্মেছিলেন তুর্কী বংশে, ট্রান্স অক্সিয়ানার 'ফারাব' নামক স্থানে ৮৭০ ঈসায়ী সনে। ৮০ বছর বয়সে ৯৫০ ঈসায়ী সনে তিনি দামেশকে ইন্তেকাল করেন। 'ফারাব' অর্থ সুন্দরতম। আরবরা এ স্থানকে ফারাব নামে ডাকতো।

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণকারী মনীষীদের এক বিস্ময় ছিলেন আল ফারাবী। মধ্যযুগে বিশ্ব সভ্যতার যখন স্বর্ণকাল চলছিল তিনি তখনই জ্ঞান বিজ্ঞানে এশিয়াবর্তী রাজ্যগুলোর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হলেও তিনি দার্শনিক হিসেবে সবচেয়ে বিখ্যাত। তাকে বলা হয় প্রাচ্যের মুসলমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। দর্শন শাস্ত্রের উপর তার অসামান্য অবদানের জন্য তিনি দর্শনের Second Aristotole বা 'দ্বিতীয় এরিস্টটল' নামে পরিচিত। ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, আল ফারাবী তৎকালীন সময়ে প্রচলিত সকল জ্ঞান বিজ্ঞানে পণ্ডিত ও পারদর্শী ছিলেন। দার্শনিক, গণিতবিদ, পদার্থবিদ, জ্যোতির্বিদ ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন তিনি। তার সঙ্গীত গ্রন্থ তখন দেশে খ্যাতি অর্জন করেছিলো।

আল ফারাবী জন্মস্থানে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর গমন করেন তৎকালীন শিল্প সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র বাগদাদ নগরীতে। এখানে এসে তিনি গ্রীক দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার উপর প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন করেন। Harran নামক স্থানে তিনি দর্শন সম্পর্কে অধ্যয়ন করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে পারদর্শী হয়ে উঠেন। প্রায় চল্লিশ বছর পর্যন্ত তিনি বাগদাদে জ্ঞানার্জনে ব্যাপৃত ছিলেন। অতঃপর

www.pathagar.com

এক রাজনৈতিক কারণে স্থান ত্যাগ করে সিরিয়ার আলেপ্পো চলে যান। এ সময় তার অর্থকষ্ট সত্ত্বেও জ্ঞান সাধনা তাকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। আল ফারাবীর জ্ঞান পিপাসা দেখে দামেশকের যুবরাজ তাকে উচ্চপদে চাকুরী দেন। কিন্তু তিনি দৈনিক মাত্র ৪ দিরহাম ভাতা নিয়েই তুষ্ট থাকতেন। এ সময়েই আল ফারাবী তার রচনাবলী প্রণয়নে ব্যস্ত ছিলেন।

আবু নাছের আল ফারাবী দর্শন বিষয়ে এরিস্টটলের খুব ভক্ত ও অনুরাগী ছিলেন। এরিস্টটল সম্পর্কে তিনি প্রায় অর্ধশতক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি দর্শন ক্ষেত্রে প্লেটো ও এরিস্টটলকে সর্বোচ্চ পণ্ডিত মনে করতেন। ইসলামের সাথে এরিস্টটল ও প্লেটোর মতবাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছিলেন তিনি। প্রচলিত মতাদর্শের সাথে কুরআনের শিক্ষা দ্বান্দ্বিক নয় এর প্রমাণস্বরূপ তিনি বহু আয়াত উল্লেখ করতেন। তার মতে, সকল বিজ্ঞানই দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। যুক্তিবাদের মাধ্যমে আল্লাহকে জানাই দর্শনের লক্ষ্য।

আল ফারাবী মনে করতেন আল্লাহ্ এক অপরিহার্য সত্তা। তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না, কেননা তিনি নিজেই তার অস্তিত্বের প্রমাণ। তিনি সংজ্ঞা বহির্ভূত ও কিছুর সাথেই তার তুলনা হয় না। তাঁর মতে আল্লাহ সম্বন্ধে জানাই আসল জ্ঞান। আর তাই দর্শনের লক্ষ্য। আল ফারাবী একজন অত্যন্ত ধর্মভীরু ও সূফী ছিলেন। সূফীবাদ সম্পর্কে তার স্পষ্ট ধারণা ছিলো। প্রেম মানুষকে আল্লাহর রাহে পৌছতে সাহায্য করে। একমাত্র প্রেমই মানুষের মনের দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে পারে। দৈহিক প্রেম ও পার্থিব মোহ মানুষের দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন করে রাখে বলে সে আল্লাহকে দেখতে পায় না। পার্থিব লোভ-মোহের ঊর্ধ্বে আল্লাহকে অবলোকন করা যায়।

আল ফারাবী মূল শিল্পকর্ম হিসেবে তার সঙ্গীত গ্রন্থ আল কবির ও ইউক্লিডার জ্যামিতির ব্যাখ্যা এবং টলেমীর আল মাজেস্টের উপর মন্তব্য করেন। একজন সুদক্ষ চিকিৎসক, জ্যোতির্বিদ ও জ্যোতিষীরূপেও তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। হিপোক্রেটিস এর শিক্ষা প্রণালীসহ খনিজ বিজ্ঞান ও পদার্থ বিদ্যার উপর গবেষণা অব্যাহত রাখেন। প্রাচ্যে অনেকদিন তার The Pearl of

www.pathagar.com

Wisdom 'জ্ঞানের মুক্তারাজি' On Poinions of Inhabitants of a Benevolent City এবং Civil Politics রচনা সমগ্র পাঠ্য হিসেবে সমাদৃত ছিলো। ফারাবী প্রায় ১৬০ টির বেশি গ্রন্থ রচনা করেন। তার অভিনন্দিত কীর্তির মধ্যে সবিশেষ খ্যাত গ্রন্থ হলো The Ideal City যা প্লেটোর The Republic-এর আদর্শে প্রভাবিত। ফারাবীর রাজনৈতিক মতবাদও রুচিসম্মত। সুদক্ষ অনুবাদক ও লিখন পদ্ধতির কলাকৌশল তিনি আয়ত্তে করেছিলেন। এছাড়া উঁচুদরের কৌতুকাভিনেতা হিসেবেও আপন জ্ঞান বৈচিত্র্যের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। বুদ্ধিজীবী মহলে তার অপরিসীম প্রভাব ছিলো। 'জ্ঞানের প্রতিমূর্তি' রূপে তিনি সব মহলে পরিচিত ছিলেন। মনীষার জগতে ফারাবীর স্থান চির অম্লান। তার অবদান কেবল প্রাচ্যের ইবনে সীনা, আল বিরুনী, ওমর খৈয়ামের মতো মনীষার চোখেই গুরুত্ব লাভে সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং ইউরোপীয় রেনেসাঁকে পর্যন্ত ত্বরান্বিত করার পথে সহায়ক হয়েছিলো।

www.pathagar.com

হাসান ইবনুল হাইছাম : ফটোগ্রাফীর জনক

পাশ্চাত্যে আল হাজেন (Al hazen) নামে সুপরিচিত হাসান ইবনুল হাইছাম বিজ্ঞানের এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। চশমা আবিষ্কারের জনক হলেও তিনি পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিত শাস্ত্রে অমূল্য অবদান রেখেছেন। ইরাকের বসরাতে তিনি ৯৬৫ ঈসায়ী সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৩৯ মতান্তরে ১০৪৪ ঈসায়ী সনে মৃত্যুবরণ করেন।

ইবনুল হাইছাম অন্যান্য বিষয় ছাড়া, অঙ্কে ৪১টি এবং জ্যামিতিতে ২৬টি গ্রন্থ রচনা করেন। শুদ্ধ অঙ্ক শাস্ত্রের মধ্যে জ্যামিতি কণিকাস, বীজগণিত, গণিতবিদ্যা, তরল পদার্থ বিজ্ঞানে অবদান তাকে বিশিষ্ট স্থান দান করেছে। পদার্থ বিদ্যার সাথে উচ্চমানের গণিতের এক অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক রয়েছে। ইবনুল হাইছাম তাই উভয়টি একত্রে আলোচনা করেন। 'কিতাবুল মুনজিরে' তিনি যেভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যামিতির ব্যবহার করেছেন তার পূর্বে কেউই তেমনটি করেননি। জ্যামিতিক সমস্যায় গোলাকৃতি প্রতিফলক থেকে আলোর প্রতিফলনের নিয়ম এবং বস্তু ও প্রতিকৃতির সম্পর্ক সম্বন্ধে সমস্যাও তার জ্যামিতিক সমাধান যেমন, একটি বৃত্ত নেয়া হোক যার কেন্দ্র বিন্দু হলো O আর ব্যাসার্ধ হলো R, এই বৃত্তের একই সমতলে রয়েছে দু'টো বিন্দু A ও B, এখন এ বৃত্তে এমন একটি M বের করতে হবে যেখানে A থেকে আলো এসে বৃত্ত থেকে প্রতিফলিত হয়ে B বিন্দু দিয়ে যাবে। অন্যভাবে সমস্যা হলো কতগুলো বিশিষ্ট অবস্থায় একটি গোলাকৃতি লেন্সের ফোকাস বের করা। সমস্যাটি Al-Hazen's problems নামে বিজ্ঞান জগতে পরিচিত। এ সমাধানটি বিজ্ঞানীদের কাছে জটিলরূপে পরিচিত। তা সত্ত্বেও এটি কিরূপ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো Prof. Marcus Bakar (১৮৮১ খৃ.) রচিত American Journal of Mathematics-এ প্রকাশিত প্রবন্ধে তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

ইবনুল হাইছাম ত্রিকোণমিতিতে বেশ উপাদেয় অবদান রেখেছেন। কিবলা নির্ণয় করার বিষয়ে তার অন্যতম গ্রন্থ 'মাকালাতু মুখতাছার ফি সামতুল

www.pathagar.com

কিবলা' গ্রন্থে তিনি ত্রিকোণমিতির কোটেনজেন্ট সম্বন্ধে একটি থিওরেম উদ্ভাবন করেন–

$$Cot\propto = \frac{Sina_1\ Cos\ (A_2-\lambda_1) - Cos\varphi_1\ tan\varphi_2}{Sin\ (A_2-A_2)}$$

তেমনি 'কওলাফি ইসতেখারাজ খাত্তা নিসফুন নাহার বেজুল্লে ওয়াহেদ' গ্রন্থে একটি ছায়া থেকে মধ্যরেখা নির্ণয় করা, দৃষ্ট ছায়া থেকে সূর্যের উচ্চতা বের করে নিতে যে সমস্যার উদ্ভব হয়, তার ত্রিকোণমিতিক সমাধান তিনি বের করেছেন এভাবে–

$$CosA = \frac{Sin\lambda\ Sin\varphi\ Sin\eta\xi}{Cos\lambda\ Cos\varphi}$$

ইবনুল হাইছাম ২শ'র কাছাকাছি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পাশ্চাত্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী হিসেবে ইউরোপের বহু ভাষায় তিনি অনূদিত হয়েছেন। ল্যাটিন, হিব্রু, স্প্যানিশ, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয় তার প্রায় ২৫টি গ্রন্থ। বিশ্বের খ্যাতনামা মিউজিয়াম, লাইব্রেরিসমূহে রক্ষিত আছে তার মূল গ্রন্থের অর্ধশতাধিক পাণ্ডুলিপি।

পদার্থ

বিজ্ঞানী ইবনুল হাইছাম বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন অন্যান্য অনেক বিজ্ঞানীর মতো। তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক বিজ্ঞানে তার নাম অত্যন্ত উচ্চকিত। ইস্তাম্বুলের অধ্যাপক ইসমাইল পাশা (মৃ. ১৯০২) তার গ্রন্থাবলীর যে তালিকা প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে ১১টি গ্রন্থ পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে বিরচিত,

www.pathagar.com

এছাড়াও বিভিন্ন লাইব্রেরিতে তার ১৩টি পদার্থ বিজ্ঞানের গ্রন্থ পাওয়া গেছে।

ইবনুল হাইছাম পদার্থ বিজ্ঞান আলোচনায় যে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তা আধুনিক বিজ্ঞানীদের বিস্ময়াভিভূত করেছে। এ সম্পর্কিত তার প্রস্তাবিত সমস্যাসমূহ ও সমাধান এই বিংশ শতাব্দীতেও বিজ্ঞানীরা horribly prolix বলে অভিহিত করেছেন। বর্তমান কালের নামজাদা বিজ্ঞানী J.F. Allen-এর বক্তব্য Al-Hazen could be said to have a 20th Century mind in a 10th Century setting'.

পদার্থ বিজ্ঞানের সব শাখাতেই ইবনুল হাইছামের অবদান আছে, তবে 'আলো'র বিষয়ে অবদানই তাকে বর্তমান বিজ্ঞান জগতে স্মরণীয় করে রেখেছে। আলোর প্রবাহ, আলোর সাথে বিভিন্ন রং-এর সম্পর্ক, আলোর প্রতিসরণ, প্রতিসরণ এবং এই প্রতিফলন প্রতিসরণের জন্য নানাবিধ দৃষ্টি বিভ্রম ও মরীচিকা সম্বন্ধে তিনি বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন এবং এসবের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। 'মাকালাতু ফিজ্‌জুয়ে' গ্রন্থে তিনি আলোর সম্বন্ধে টলেমির থিওরিকে কেবল ক্ষুদ্র প্রতিসরণ কোণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, বৃহৎ কোণের বেলায় এটা খাটে না এই বক্তব্য সপ্রমাণ করেন। ড. রাজী উদ্দীন সিদ্দিকীর মতে, তিনি আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণের নিয়ম আবিষ্কার করেন, যা বর্তমান Snells's Law নামে পরিচিত। গোলাকার স্বচ্ছ কাঁচখণ্ড যা গোলাকার পাত্রে রাখা পানির মধ্য দিয়ে আলোর প্রতিসরণ নিয়েও তিনি পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান।

ইবনুল হাইছামের মতে, একটি হালকা স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অপেক্ষাকৃত ভারী আরেকটা স্বচ্ছ মাধ্যমে প্রবেশ করার সময় আলোর যে প্রতিসরণ বা দিক পরিবর্তন হয়, বিভিন্ন মাধ্যমে আলোর বেগের তারতম্যই তার কারণ।

তিনি নির্ভুলভাবে ভারী মাধ্যমের চেয়ে হালকা মাধ্যমে প্রবেশের সময় আলোর রশ্মি কোন্ দিকে কিভাবে বেঁকে যায় নির্ণয় করেন। পরবর্তীকালে নিউটনও এ বিষয়ে সঠিক বর্ণনা করতে পারেননি। প্রসিদ্ধ ফরাসী বিজ্ঞানী Pierre de Fomet ইবনুল হাইছামের উক্ত থিওরির বৈজ্ঞানিক রূপ প্রদান করেন তার ন্যূনতম সময় (Principle of Lest Time) এর প্রস্তাবনায়।

www.pathagar.com

এই আরব বিজ্ঞানী আলোর আপতন ও প্রতিসরণ পথ এবং এই দুই মাধ্যমের অন্তর্বর্তী সমতলের উপর অঙ্কিত সরল রেখা একই সমতল ক্ষেত্রের উপর অবস্থিত এ পর্যন্ত আবিষ্কার করেন। এর ৫ শত বছর পর লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Willebrod Snell (1591-1600) উক্ত দুই পথের কোণের মধ্যে যে এটির সম্পর্ক রয়েছে তা উদ্ভাবন করেন। ইবনুল হাইছাম তার বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় কত উচ্চ মার্গে অবস্থান করছিলেন তা এ ঘটনা থেকেই বুঝা যায়।

'রিসালাতু ফিশ্‌শফক' (Courses on Twilight) গ্রন্থে তিনি বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বসীমা নির্ণয় করেন। মাকালাতে ফি কাওস ফাজহিন ওয়াল হালাত' (Memoir on the Rainbow and the Helo) গ্রন্থে রামধনু, বস্তুর ছায়াপাত নিয়ে আলোকপাত করেন। "মাকালাতু ফিল মারাইয়াল মুহরিকা বিল কুতুঅ" Memoir on conical burning mirrors গ্রন্থে Dioptra প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনায়, আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ, প্রতিবিম্বের স্বরূপ ও তার নানা দোষ যেমন গোলাপের (spherical aberration) বর্ণাপেরণ (Chromatic aberration) প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। এছাড়া মাকালাতু ফিল মারাইকলাল মুহরিকা বিদ দাওয়ারের (Memoirs on Circular burning, Glasses), 'মাকালাতু ফিল জুয়েল কামার' (Memoir on the moon) গ্রন্থসমূহে আলো দিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। পদার্থ বিদ্যার আলোর শাখায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করলেও তার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান 'কিতাবুল মানাজির' গ্রন্থে প্রস্তাবিত তাত্ত্বিক মতবাদ, তার প্রস্তাবিত তাত্ত্বিক মতবাদ বিজ্ঞানে নতুন পথ খুলে দেয়। এতে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, চোখ থেকে আলোক রশ্মি কোন বস্তুর উপর পড়লেই সে বস্তুটা দেখা যায় না বরং কোন বস্তু থেকে আলোক রশ্মি চোখে এসে পড়লেই তবে সে বস্তু আমরা দেখতে পাই। ইউক্লিড, এরিস্টটল, টলেমী প্রমুখ গ্রীক বিজ্ঞানীর মতবাদের বিপরীতে এ বক্তব্য তৎকালীন পদার্থ বিদ্যায় এক বিরাট বিপ্লব সাধন করেছিল। কিন্তু গ্রীক বিজ্ঞান পূজারি জগৎ তার এ মতবাদ

www.pathagar.com

সহজে গ্রহণ করতে পারেনি। ত্রয়োদশ শতকের ইহুদী বিজ্ঞানী জোসেফ বিন জুদা আকনিন ইউরোপে এ মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেন ফলে ইউরোপের রেনেসাঁ যুগে 'কিতাবুল মানাজির' গ্রন্থটি বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। লেখার এক শতাব্দীর মধ্যেই জিরার্ড ও উইটেলে কর্তৃক ল্যাটিনে অনূদিত হয়। এ অনুবাদের মারফতই ইউরোপে বিজ্ঞানের জন্মদাতা ফ্রান্সিস বেকন, রজার বেকন জন, পেকহাম প্রমুখ পদার্থ বিজ্ঞানী বিশেষ করে Optics শাখার প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৬/১৭ শতাব্দীতে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, জোহানেস কেপলার প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ এ গ্রন্থকে ভিত্তি করে আলোর ধর্ম ও স্বরূপ সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ১৭ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের কেপলার (1571-1630), দেকর্তে, রোমার (১৬৬৪-১৭১০) প্রমুখ আলোর গমনে কোন সময়ের প্রয়োজন হয় না এ মতকে সত্য জেনে বসেছিলেন, অথচ হাইছামসহ আল বিরুনী, ইবনে সীনা ১১ শতকে প্রমাণ করেছিলেন যে, আলোর গতি শব্দের গতির চেয়ে দ্রুত, আলোর গতিবেগে সময় লাগে প্রভৃতি মতবাদ।

ইবনুল হাইছামের আলোর মতবাদ, ইউরোপে কি বিরাট প্রভাব বিস্তার করে তা বুঝা যায় তাদের উচ্চসিত বাক্যবাণে। পোল্যান্ডের- Dr. zygnunt Rybilli বলেন- The name of Al-Haitham is connected with history of Polish science by an old tradition his work having served as basis for further research by our thirdteenth century scholar witelo Coilek Who also made Al-Haithams work accessible to Europe in Lathin translation.

আমেরিকার জর্জ সারটনের কথায়: Kitab at Maneger must be listed among the leading elassics; indeed it influenced scientific thought for six centuries.

অস্ট্রেলিয়ার Sir M.L. Oliphant এর মতে, 'His elegant use of geometry and mathematics in physics preceeded by seven hundred years, the discoveries of Newton'.

www.pathagar.com

চিকিৎসা

ইবনুল হাইছাম চক্ষু চিকিৎসার ব্যাপারে এক যুগপৎ অবদান রেখেছেন। Physics ও Mathematics সম্বন্ধে তাত্ত্বিক জ্ঞানকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে কিভাবে ব্যবহার করা যায়, তিনি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। চোখের এনাটমী পরীক্ষা করে তিনি Scleroid, Cornea, Choroid, Iris প্রভৃতি পার্থক্য সুষ্ঠুভাবে নির্ধারণ করেছেন। তিনি চোখের retina, optic nerve এর কাজ, চোখের দুই রসের জলীয় (Aqueous) এবং স্বচ্ছ (Vilreous) কাজ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেন।

বর্তমানে Lens ইংরেজী শব্দটি ইবনুল হাইছামের আরবীতে ব্যবহৃত 'আদাসা' শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। 'আদাসা' অর্থ মসুরের ডাল, চোখের লেন্স মসুরের ডালের মতো biconvex ল্যাটিন অনুবাদকরা এই আদাসাকে তাই Lenticulumn বলে অনুবাদ করেন। এই শব্দটি আজ Lens নামে পরিচিত হচ্ছে।

ইবনুল হাইছামের তাত্ত্বিক মতবাদ প্রযুক্তির মাধ্যমে চশমা আবিষ্কারে সাহায্য করে বলে তিনি চশমা আবিষ্কারের আদি পুরুষ।

হিট্টির বক্তব্য, In certain experiments he approaches the theoretical dicovery of magnifying glasses which was actually made in Italy three centuries later.

www.pathagar.com

বিজ্ঞান জগতে ইবনে যুহর পরিবার

সুদীর্ঘ ৩০০ বছর ধরে একটি পরিবার একটি দেশের বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি জগৎ আলোকিত করে রেখেছিল- শুনলে কল্পলোকের গল্প মনে হতে পারে। কিন্তু তাই হয়েছিল মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতার আলোকভূমি স্পেনে। এই সময়কালে 'ইবনে যুহর' নামক পরিবারে যশস্বী বিদ্বান এবং অসামান্য প্রতিভাধর বেশ কয়েকজন মনীষী পর পর জন্মগ্রহণ করে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। মূলতঃ আরব দেশ থেকে এসেই ১০ম শতাব্দীর শুরুতে তারা স্পেনে বসবাস শুরু করেন জাতিবা নামক স্থানে। তখন থেকে ১৩ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই পরিবারের খ্যাতি অক্ষুণ্ন থাকে। এই পরিবারের প্রথম ব্যক্তি যিনি স্পেনে বসতি স্থাপন করেন তার নাম 'যুহর'। এই নাম থেকেই পরিবারটি 'ইবনে যুহর' পরিবার নামে খ্যাতি লাভ করে।

ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান পরিবারটির যে বংশ তালিকা দিয়েছেন তা হলো- যুহর>মারওয়ান>আবু বকর মুহাম্মদ>আবু মারওয়ান>আবদুল মালিক ইবনে আবিল আলা আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আবদিল মালিক>আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনুল হাফীদ>এবং আবুল আলা মুহাম্মদ।

যুহর পরিবারের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা প্রথমোক্ত যুহর আল ইয়াদী- ১০১০ ঈসায়ী সনে তালাভেরায় ইন্তেকাল করেন। তার নাতি আবু বকর মুহাম্মদ এই পরিবারের খ্যাতনামা ব্যক্তি। তিনি ছিলেন আইনজ্ঞ এবং সাহিত্যিক। বিজ্ঞানের নানা বিষয় এবং ইলমে হাদীসে তার ছিলো অসাধারণ পাণ্ডিত্য। ১০৩১ ঈসায়ী সনে ৮৬ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আবু বকরের পুত্র আবু মারওয়ান আবদুল মালিক ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ। বহু বিষয়ে তার দক্ষতা ছিলো বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কায়রোতে তিনি দীর্ঘদিন চিকিৎসা বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। স্পেন থেকে প্রত্যাবর্তন করে 'দানীয়াতে' স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তৎকালীন শাসক মুজাহিদ তাকে স্বাগত জানান। ক্রমে আইবেরী উপদ্বীপের সর্বত্র তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ইবনে দিহইয়ার বর্ণনা মতে, আবু মারওয়ান বাগদাদেও প্রধান চিকিৎসক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

ইবনে আবী উসাইবিয়ার মতে, তিনি চিকিৎসা বিষয়ে উদারপন্থী ছিলেন। দেহের স্বাভাবিক রস সৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটায় বলে তিনি গরম পানিতে গোসল করতে নিষেধ করতেন। আবু মারওয়ান 'দেনিয়া' মতান্তরে 'সেভিলে' ১০৭৮ ঈসায়ী সনে ইন্তেকাল করেন।

বংশের পঞ্চম পুরুষ আবু মারওয়ান পুত্র আবুল আলা বিন যুহর কর্ডোভাতে লেখাপড়া শিখেন। পূর্ব-পুরুষদের চেয়ে চিকিৎসা শাস্ত্রে তার খ্যাতি বৃদ্ধি পায়। সেভিলের আব্বাসীয় শাসক আল মুত্তায়াহীদ এর শাসনামলে (১০৪২-৬৮ ঈসায়ী সন) তিনি পিতার কাছেই চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন। হাদীস ও ধর্মীয় জ্ঞানে তার ছিলো অগাধ অধিকার। সেভিলের 'উজির' হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। ইবনে দিহ্ইয়ার মতে, তিনি এ যুগের উজির, প্রথম শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, যোগ্য দার্শনিক ও চিকিৎসক ছিলেন।

জীবদ্দশাতে মরক্কোর আবুল আলার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য জগতেও তিনি যথেষ্ট সমাদৃত হন। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণের কাছে তিনি Aboali, Abuleli, Ebiluli, Abulelizar, Albuliezar প্রভৃতি নামে পরিচিত। তিনি প্রায় ১০টি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে 'কিতাবুত তাজকিরা' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যবহারিক কার্যকলাপের বিবরণ সমৃদ্ধ এই গ্রন্থটি তিনি মরক্কো থাকতেই রচনা করেন। এতে তিনি মরক্কোর আবহাওয়া, তার Pathological অবস্থা, Dentolog এবং গ্যালনের চিকিৎসা বিজ্ঞানের দার্শনিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। বিজ্ঞান জগতে তার যথেষ্ট পরিচিতি থাকলেও সারটনের মতে, অতীব কীর্তিমান পুত্র ইবনে যুহরের (Avengoar) পিতা হিসেবেই তিনি বেশি সমাদৃত। কাঁধের এক প্রকার ঘায়ে তিনি ১১৩০ ঈসায়ী সনে কর্ডোভায় মৃত্যুবরণ করেন।

যুহর পরিবারের সবচেয়ে যে উজ্জ্বল নক্ষত্রটি তিনি আবু মারওয়ান আবদুল মালিক 'ইবনে যুহর' পাশ্চাত্য জগতে Abhomeron, Avenzoor, Avenzoar নামে সুপরিচিত। সেভিলে জন্মগ্রহণকারী এই মহান কীর্তিমান এর জন্মতারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। G. Colin-এর মতে ১০৯২-৯৫ ঈসায়ী সনের মধ্যে তার জন্ম হয়। Hitti উল্লেখ করেছেন ১১৯৪ ঈসায়ী সনে। তবে Encyclopaedia Britanica (Vol-2)-তে ১১১৩ ঈসায়ী সনে

www.pathagar.com

উল্লিখিত হয়েছে। তবে প্রায় সবাই তার মৃত্যু তারিখ উল্লেখ করেছেন ১১৬১ ঈসায়ী সনে।

ইবনে যুহরের শিক্ষাজীবন শুরু হয় তার বাবার কাছেই। সাহিত্য ও আইন বিষয়ে তিনি প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। Encyclopaedia of Islam লিখেছে He was taught medicin by his father and excelled in it an early age. He had received also a solid literary and juridical education. He does not seem to have travelled to the East, but he certainly went to North Africa. He was in the service of the Almoravid dynasty and received wealth and favours from these rules. রাজ দরবারের আনুকূল্য যেমন তিনি পেয়েছিলেন, তেমনি বৈজ্ঞানিক মতামতের কারণে ক্ষমতাসীনদের রোষে পড়ে ১১৪০ সালে জেলও খেটেছিলেন। তিনি উজিরসহ রাষ্ট্রীয় প্রধান চিকিৎসকের পদে দায়িত্ব পালন করেন। প্রখ্যাত চিকিৎসক, বিজ্ঞানী ও দার্শনিক ইবনে রুশ্‌দ তার সহপাঠী ছিলেন।

আবু মারওয়ান আবদুল মালিক ইবনে যুহর শুধু তৎকালীন মুসলিম জগতেই নয়, সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানী ছিলেন। তার পরিবারের অনেকের মধ্যে 'ইবনে যুহর' হিসেবে তাকেই প্রধানত উল্লেখ করা হয়। সর্ববিদ্যা বিশারদ হওয়ার চেয়ে তিনি Physician থাকতে পছন্দ করতেন। তিনি গ্যালেন প্রভাবিত চিকিৎসক এবং আর রাজীর পরে মুসলিম জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ Clicical. অন্যান্য মুসলিম চিকিৎসকের সঙ্গে তার পার্থক্য ছিলো তিনি নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী থিওরি গড়ে তুলেছেন। অধ্যাপক মেটলারের মতে, ইবনে যুহর তার পূর্ববর্তীদের চেয়ে সর্বাপেক্ষা বেশি মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি পাকস্থলীর ক্যানসার (Gastric carainoma), কণ্ঠনালীর ক্যান্সার (Serous perirarditis) এর বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি সর্বপ্রথম প্রচার করেন যে, Scabies বা খোসপাঁচড়া হয় Itchmite এর জন্যে। তিনি প্রথম Itchamite এর স্বরূপ বর্ণনা করেন। সে হিসেবে ৬ষ্ঠ শতকের Alexander of Trajles এরপর তিনি সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

Parasitologist. তার মতে শরীরের চামড়ার নীচে সাধারণ চোখে দেখা যায় না এরকম ছোট ছোট জীবাণু রয়েছে। চুলকালে এগুলো বেরিয়ে আসে।

ইবনে যুহর সর্বপ্রথম চিকিৎসায় বেজওয়াজ পাথর ব্যবহার করেন। তিনি পাণ্ডু রোগের জন্য (Jaundice) এ পাথর ব্যবহারের ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিলেন, যা ১৬ শতক পর্যন্ত ইউরোপে প্রচলিত ছিলো। Noctole Mondaress (1492-1588 AD) ইবনে যুহরের এ পদ্ধতিই হুবহু অনুসরণ করেছেন।

ইবনে যুহর কতটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তা জানা যায়নি, তবে এ পর্যন্ত তার ৯টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে কিতাবুত তাইসির ফিল মুওয়াতেত তাদবির, কিতাবুল আগোজিয়া, কিতাবুল ইকতিসাদ ফি ইসলাহিল আনফুস ওয়াল আজসাদ, কিতাবুল জিনিয়া, মাকালা ফি ইলালিল কুল্লী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান 'কিতাবুত তায়সির (Book of Simplification concerving Therapeutics & Diet). ৩৫ বছরের বড় অথচ বন্ধু ভাবাপন্ন সহপাঠী ইবনু রুশ্‌দের অনুরোধে তিনি এ গ্রন্থটি রচনা করেন। এতে তিনি রোগ ও তার ব্যবস্থাপত্র, পথ্য ও ঔষধ তৈরির পদ্ধতি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। টিউমার, Intestinal pathisis, pharyngeal paralysis, inflamation of the middle ear, medistinal abscess, Renal calculas অপারেশন, শ্বাসনালীর অস্ত্রোপচার, চোখের রোগ, ছানি তোলার অপারেশন, Miosis, Mydriasis প্রভৃতি বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেন। তিনি শল্য চিকিৎসায়ও পারদর্শী ছিলেন।

তার 'তাইসির' গ্রন্থটি হিব্রু ও ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়ে বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়। Paravici কৃত ল্যাটিন একটি অনুবাদ বেশ জনপ্রিয় ছিলো এবং ১৩ শতকে এর কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইটালী, জার্মানী, ভেনিস প্রভৃতি স্থানে এর কপি বিদ্যমান আছে।

ইবনে যুহর ছিলেন ইউরোপে সবচেয়ে প্রভাবশালী মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী। ড. ক্যাম্পবেল এ মত সমর্থন করেন। Arnold of Villanova (মৃত্যু ১৮১২ ঈসায়ী সন) তার গ্রন্থ রচনায় ইবনে যুহরের উপর নির্ভর করেছেন সম্পূর্ণভাবে। মধ্যযুগে ইউরোপের Consilia কে তার চিকিৎসা প্রক্রিয়ারই অনুসরণ বলা চলে। ইউরোপে ১৭ শতক পর্যন্ত তার প্রভাব অক্ষুণ্ন থাকে।

www.pathagar.com

আবু বকর মুহাম্মদ ছিলেন ইবনে যুহরের পুত্র। পরবর্তী খ্যাতিমান কবি ও চিকিৎসাবিদ। তিনি ১১১০ ঈসায়ী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুরআনে হাফিয, হাদীস শাস্ত্রবিদ এবং আরবী সাহিত্যে প্রভৃত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি পিতার কাছে চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন এবং পরবর্তীকালে খলীফা ইয়াকুব আল মনসুরের ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত হন তবে কবি হিসেবে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল বেশি। তিনি চক্ষু রোগের চিকিৎসা বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। তার মৃত্যু হয় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায়। খলীফার দরবারে ঈর্ষাকাতর উজির আবু যায়দ আবদুর রহমান ইবনুল ইউজান তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করান। খলীফা এতে খুবই মর্মাহত হন এবং তিনি নিজে তার জানাযা পড়ান। তার পরিবারের আরো কয়েকজন গুণীর এ ধরনের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছিল। তার পরিবারের মহিলারাও ধাত্রী বিদ্যায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ইবনে যুহরের কন্যা, দোহিত্রীসহ অনেকেই চিকিৎসাবিদ্যা সংশ্লিষ্ট সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। একই পরিবারের অনেক পুরুষ মহিলা এভাবে বিজ্ঞান চর্চায় পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

আবু বকরের একমাত্র পুত্র ছিলেন আবু মুহাম্মাদ ইবনুল আবদুল্লাহ ইবনুল হাফীদ। তিনি ১১৮১-৮২ ঈসায়ী সনে সেভিলে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র ২৫ বছর বয়সে ১২০৫-৬ ঈসারী সনে বিষ প্রয়োগে তার মৃত্যু ঘটে। আল মুত্তায়াহীদ রাজ দরবারে তিনি চিকিৎসক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। পারিবারিক উত্তরাধিকার অনুযায়ী চিকিৎসাবিদ হিসেবে তিনি প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রেখেছিলেন। কিন্তু শত্রুতামূলক মৃত্যু তার ও তার পরিবারের অগ্রযাত্রা স্তিমিত করে দেয়। শত শত বছর ধরে পারিবারিক ঐতিহ্য যা ছিলো তা আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ-এর মৃত্যুর ফলে শেষ হয়ে যায়। তার দুই পুত্র সেভিলে বাস করতেন। এর মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র আবু আলা মুহাম্মদ গ্যালেন-এর রচনাবলী অধ্যয়ন করেছিলেন। জানা মতে, তিনিই ছিলেন ইবনে যুহর পরিবারের শেষ চিকিৎসাবিদ।

www.pathagar.com

ইবনে খালদুন : সমাজ বিজ্ঞানের জনক

ইতিহাস লিখতে গিয়ে যে স্পেনীয় মনীষী 'সমাজ বিজ্ঞান' নামক নতুন বিজ্ঞান এবং ধারণার জন্ম দেন তিনি হলেন আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খালদুন আল হাজরামী (জন্ম. ৭৩২ হি./১৩৩২ ঈসায়ী সন)। তিনি তিউনিসে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র ১৮ বছর বয়সে সকল শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তার জীবন ছিলো নানা ঘাত-প্রতিঘাতে পরিপূর্ণ। নানা রাজন্যবর্গের সংস্পর্শে তিনি আসেন এবং নানা জায়গা ভ্রমণ করেন; তবে চতুর্দশ শতকের আফ্রিকার রঙ্গমঞ্চে যে সকল বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল তিনি সেগুলোর সাথে জড়িত ছিলেন প্রত্যক্ষভাবে।

সক্রিয় রাজনীতির ময়দানে এক সময় তার বিতৃষ্ণা দেখা যায় এবং তিনি ইবনে সালামার নির্জন দুর্গে জ্ঞান-সাধনায় লিপ্ত হন। ১৩৭৪ হতে ১৩৭৮ ঈসায়ী সন পর্যন্ত এই চার বছর তিনি উত্তর আফ্রিকার উক্ত দুর্গে গবেষণায় রত থাকেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম 'সমাজ বিজ্ঞান' নামক নতুন বিদ্যার ধারণা উদ্ভাবন করেন। ১৩৮০ ঈসায়ী সনে তিউনিসের জাইতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে তিনি তার বিশ্ব ইতিহাসের প্রথম খণ্ড 'আল মুকাদ্দিমা' রচনা করেন। এটি ছিলো এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। বিশ্বের সকল দেশের পণ্ডিতগণ একবাক্যে এই রচনাটির শ্রেষ্ঠত্ব ও অভিনবত্বের প্রশংসা করেছেন। মুকাদ্দিমা (Prolegomena) তার তিন খণ্ডের ইতিহাস গ্রন্থের প্রথম খণ্ড।

ইবনে খালদুনের তিন খণ্ডে সমাপ্ত বিশাল গ্রন্থটির নাম- 'কিতাব আল ইবার ওয়া দিওয়ান আল মুবতাদা ওয়াল খবর ফি আইয়াম আল আরাবী ওয়াল আজমী ওয়াল বারবার ওয়ামান আশরাহুম সি খোয়াই আল সুলতান আল আকবর'। গ্রন্থের তিনটি খণ্ডের পরিচিতি হলো :

১. আল মুকাদ্দিমা অর্থাৎ ভূমিকা, এতে সমাজ, সমাজের উত্তরাধিকারের বৈশিষ্ট্য, যেমন সার্বভৌমত্ব, কর্তৃত্ব, ব্যক্তির জীবিকা নির্বাহ, পেশা, বিজ্ঞান ও তার মূল কারণসমূহ আলোচিত হয়েছে।

২. আরব জাতির ইতিহাস : এই খণ্ডে আরব জাইতরণ বংশ ও প্রশাসনিক

www.pathagar.com

ইতিহাস এবং সমসাময়িককালে সে ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি, সমসাময়িক যুগের জাতি, মনীষী এবং বিভিন্ন জাতির রাজত্ব– যেমন : পোনতিয়েন, সিরীয়, পারসিক, ইহূদী, কীবতি, গ্রীক, রোমান, তুর্কী ও ফরাসীদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

৩. বারবার জাতি এবং সংশ্লিষ্ট গোত্রের ইতিহাস : বারবার গোত্রের উৎপত্তি, রাজ্য বিস্তার এবং উত্তর আফ্রিকায় রাজত্বকারী তাদের বিভিন্ন বংশের বিবরণ। ইবনে খালদুনের এই বিশাল গ্রন্থটি সাত খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে 'মুকাদ্দিমা' সম্পূর্ণ স্থান পেয়েছে। এতে সমাজতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা রয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ড ইতিহাস– যেটি ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডে পরিব্যাপ্ত। দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, সকল গুরুত্ব ও মূল্য সত্ত্বেও তার এই রচনাবলী উনিশ শতক পর্যন্ত অপ্রকাশিত থেকে যায়। মাঝে মাঝে মুকাদ্দিমা অংশের বাছাই করা রচনার অনুবাদ প্রকাশিত হলেও পূর্ণাঙ্গ রচনা বহু শতক যাবত প্রকাশিত হয়নি। ইবনে খালদুনের মুসলিম সাম্রাজ্য সম্পর্কিত ইতিহাস ১৮৪১ ঈসায়ী সনে নোয়েল ভারগার কর্তৃক ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। রয়্যাল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ১৯ নম্বর পাণ্ডুলিপি থেকে কোয়াট্রি মেয়রের সম্পাদনায় ১৮৫৮ সালে প্যারিসে মুকাদ্দিমা'র তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। একই সালে শেখ নাসের আল হুরানী কর্তৃক কায়রোতে মুকাদ্দিমা প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৭৯ সালে বৈরুত থেকে মুকাদ্দিমা প্রকাশিত হয়। কায়রোর সরকারী মুদ্রণ বিভাগ ইবনে খালদুনের পুরো গ্রন্থটি সাত খণ্ডে প্রকাশ করে। ১৮৬৮ তে শেষ খণ্ডটি প্রকাশিত হয় এবং বিশ্বের বহু দেশে, বহু ভাষায় তার গ্রন্থ অনূদিত হতে থাকে।

তার মুকাদ্দিমার হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি বার্লিন, লিডেন, ফ্লোরেন্স, লেনিনগ্রাড, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, মিলান, মিউনিখ, ভিয়েনা, আল আজহার, ফেজস্থ কোরানিয়া মসজিদ, অক্সফোর্ড, তুরিনজেন, তিউনিস ও আলজিয়ার্সে সংরক্ষিত রয়েছে।

ইবনে খালদুনের আরেকটি রচনা হচ্ছে তার আত্মজীবনী 'আল আরিফ'। সুদীর্ঘ আকারে আত্মজীবনী রচনায় তিনিই প্রথম স্বাক্ষর রাখেন। এতে নিজের সম্পর্কে এমন তথ্য তিনি উল্লেখ করেছেন যা সাধারণত

www.pathagar.com

আত্মজীবনীতে উল্লেখ করা হয় না। তিনি নিজেকে ইতিহাসের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলে মনে করতেন এবং যথার্থই তিনি তাই ছিলেন।

ইতিহাস অধ্যয়নে নতুন ধারণা সম্পর্কে ইবনে খালদুন বলেন : 'এই বিশ্বের ইতিহাসে ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে মিথ্যা থেকে সত্যকে পৃথক এবং সম্ভব ও অসম্ভবকে চিহ্নিত করার ব্যাপারে অত্যন্ত কার্যকর। এজন্য মানবজাতিকে সমাজের দিকে তাকাতে হবে। কোন সমাজকে বিশ্লেষণ করতে হলে তার যে অবস্থাসমূহ বৈশিষ্ট্যসহ চিহ্নিত, সময়ে সময়ে যেসব ঘটনা বা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং যেসব অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার প্রশ্নই উঠে না, এই তিনটি অবস্থাকে পৃথক করতে হবে। এরপর একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা মিথ্যা থেকে সত্যকে পৃথক করে নিতে পারবো এবং এভাবেই সুব্যবস্থিত পদ্ধতিতে আমরা নিঃসন্দেহে উপনীত হবো সঠিক প্রমাণের জন্য।' এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই তিনি মানুষের যাযাবর জীবনযাত্রা থেকে রাষ্ট্র ও দেশের পত্তনের মাধ্যমে স্থায়ী বসবাসের অবস্থা পর্যন্ত সকল পর্যায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গবেষণার মাধ্যমে বিচার-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা চালান। এই গবেষণায় তিনি মানব সমাজের দৃঢ়তা ও দুর্বলতা, নব্য ও পুরাতন যুগ, উত্থান ও পতন সকল অবস্থার দিকে সমান নজর দিয়েছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ইবনে খালদুন সমাজের সুপরিসর ভিত্তির উপর ইতিহাসকে দাঁড় করিয়ে গেছেন; তার পূর্ববর্তী আর কেউ ইতিহাসকে এভাবে গ্রহণ করেন নি।'

সমাজতত্ত্ব আলোচনায় ইবনে খালদুন পুরো বিষয়টিকে ছয়টি পর্যায়ে বিভক্ত করেন। তা হলো–

১. সাধারণ মানব সমাজ, তার প্রকারভেদ এবং বিশ্বে তার ভূমিকা।
২. যাযাবর সমাজ, উপজাতি ও জাতির উদ্ভব।
৩. রাষ্ট্র, খেলাফত, সার্বভৌমত্ব ও শাসকের কার্যাবলী।
৪. সভ্য সমাজ, দেশ, শহর ও নগরী।
৫. ব্যবসা-বাণিজ্য, জীবনযাত্রার পদ্ধতি ও জীবিকা অর্জনের উপায়।
৬. বিভিন্ন বিজ্ঞান এবং সেসব আরম্ভের পদ্ধতি।

www.pathagar.com

শুধুমাত্র এ বিষয়গুলো দেখলেই বুঝা যায় তিনি কত গভীরভাবে সমাজকে নিরীক্ষা করেছিলেন। তিনি সমাজের উৎপত্তির কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করেছেন। তার মতে, মানুষ ও অন্যান্য জীবের মধ্যে পার্থক্য তিনটি–

১. মানুষ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী।
২. মানুষ সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন শাসকের নিয়ন্ত্রণাধীনে সুস্থ সমাজ জীবন যাপনের অভিলাষী।
৩. জীবন ধারণের জন্য তারা দলবদ্ধভাবে থাকতে আগ্রহী।

সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্ম প্রসঙ্গে তিনি বলেন : মানুষের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার মনোভাব থেকেই সমাজের সৃষ্টি হয়। আর সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানকল্পে এবং অন্যায়ভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের দমনের নিশ্চিত প্রয়োজন দেখা যায়– এ প্রয়োজনের ফল হিসেবেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি।' সমাজ এবং রাষ্ট্র সম্পর্কে ইবনে খালদুনের মতামত ছিলো মৌলিক চিন্তা-ধারার ফসল। তিনি বলেছেন, রাষ্ট্রীয় শক্তির মূল অনুপ্রেরণা আসে গোষ্ঠী সংহতি থেকে। এই সংহতিকে তিনি 'আসাবিয়া' বলে আখ্যায়িত করেছেন। 'আসাবিয়া' অর্থ 'জাতি সমষ্টি বা রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়তা।' এ সম্পর্কে তিনি ব্যাপক তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন এটা দার্শনিক আদর্শ রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের স্বাভাবিক আয়ু বেশি হলে চার পুরুষ আর এ চার পুরুষ পরিবর্তনের পর পাঁচটি পর্ব অতিক্রম করে রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে যায়। এ সংশ্লিষ্ট বর্ণনায় তিনি দেখিয়েছেন অর্থনৈতিক কারণ এর অন্যতম। Prof. Rosenthoal বলেন : 'ইবনে খালদুন হচ্ছেন মধ্যযুগের প্রথম চিন্তানায়ক যিনি রাষ্ট্রনীতিতে এবং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সংঘটিত যে কোনো সমাজের সার্বিক জীবনে অর্থনীতির গুরুত্বের বিষয় উপলব্ধি করেন।' ইতিহাস-দর্শন, সমাজ বিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ইবনে খালদুনের এই গভীর চিন্তাধারা ছিলো তার যুগের চেয়ে কয়েক শতাব্দী অগ্রগামী। তাই আধুনিক কালের সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মেকিয়াভেলি, ভিকো, গীবন, মন্টেস্কো এ্যাডম স্মিথ, অগাস্ট কোতে, টিটকানো ক্লাসিও, নোথালিয়েল স্মিড প্রমুখকে, তার

www.pathagar.com

সম্পর্কে উচ্চ মন্তব্য করতে দেখা যাচ্ছে। এদের কয়েকজন তো ইবনে খালদুন চিন্তায় গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

R. A Nicholson-এর ভাষায়– His intellectual descendants are the great medieval and modern historians of Europe- Machiavelli and Vico and Gibbon.

Arnold Joseph Toybee-এর মন্তব্য হচ্ছে– Thucydides, Machiavelli and Clarendon are brilliant representatives of brilliant times and places. Ibn Khaldun is the sole point of light in his quarter of the firmament.

এর সাথে Dr. Buddha Prakash-এর স্পষ্ট বক্তব্য উল্লেখ করা যায়– Ibn Khaldun flashed like a solitary star in a pervassive pall of darkness. He is the father of sociology, the scientific method of human studies and originator of the philosophy of history.'

www.pathagar.com

মূসা আল খারিজমী : বীজগণিতের জনক

বীজগণিত বা 'এলজেব্রা'র নাম শুনেনি এমন শিক্ষিত মানুষ হয়তো নেই। এই 'এলজেব্রা' গাণিতিক হিসাব পদ্ধতিকে বৈপ্লবিকভাবে সহজ করে দিয়েছে। তাই আজ সর্বাধিক যুগেও এই শাস্ত্রটির ব্যবহার ও শিক্ষা সর্বত্র লক্ষা করা যায়। স্মর্তব্য যে, এ বৈপ্লবিক পদ্ধতিটি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন বিশ্বখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী, গাণিতিক, জ্যোতির্বিদ ও ভূগোলবিদ আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে মূসা আল খারিজমী। সংক্ষেপে আল খারিজমী নামে তিনি পরিচিত।

সে প্রায় এক হাজার দুইশ বছরের আগের কথা। মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগে পারস্যের খিভা নামক প্রদেশের 'খারিজমা' নামক স্থানে ৭৮০ ঈসায়ী সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাগদাদে তখন বিদ্যোৎসাহী মামুনের শাসনকাল। আল খারিজমীর প্রচণ্ড জ্ঞান-পিপাসা এবং বিজ্ঞান প্রতিভা তাকে মুগ্ধ করে। খলীফা খারিজমীকে বাগদাদের বিশ্ববিখ্যাত জাহানপীঠ লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করেন। রাজকীয় এই লাইব্রেরির দায়িত্ব পেয়ে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক বিশাল সম্ভারের সাথে পরিচিত হন। তিনি খলীফার অন্যতম গুণী সভাসদের নিযুক্তিও লাভ করেন।

সোনালী যুগের মুসলিম বিজ্ঞানীদের জ্ঞান-সাধনা ছিলো বহুধা বিভক্ত এবং বিচিত্র প্রতিভায় সিক্ত। তারা প্রত্যেকেই একাধিক বিষয়ের উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং মৌলিক অবদান রেখে গেছেন। আল খারিজমী ছিলেন তেমনি একজন। তার সময়ের প্রচলিত বিজ্ঞানের একাধিক বিষয়ে তিনি সাধনা করেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, বীজগণিত এবং ভূগোল বিষয়ে তার অনন্য অবদান আজো সভ্যতার ইতিহাসে অক্ষয় অমর করে রেখেছে তাকে।

আল খারিজমীর সবচেয়ে উজ্জ্বল অবস্থান ছিলো বীজগণিতে। গণিতশাস্ত্রের অন্যতম এই শাখাটির তিনি উদ্‌গাতা। তার সাধনা বীজগণিতকে গণিতশাস্ত্রের মর্যাদায় সমাসীন করেছে। এই বিষয়ে তার অনবদ্য সৃষ্টি

www.pathagar.com

'ইলমুল জাবির ওয়াল মুকাবালা'। এই গ্রন্থটির জন্য বীজগণিতের জনক হিসেবে তিনি স্বীকৃত। প্রসঙ্গত যে, অনেকে মনে করেন বীজগণিত ইউরোপীয়দের আবিষ্কৃত এবং 'এলজেব্রা' শব্দটি ইংরেজী থেকেই এসেছে। কিন্তু প্রকৃত কথা হলো ইউরোপীয় ভাষাবিদগণ আরবী বীজগণিতের 'ইলমুল জাবির ওয়াল মুকাবালা' গ্রন্থটি প্রথমে ল্যাটিন এবং পরে ইংরেজী ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। বিভিন্ন ভাষান্তরণের কারণে 'ইলমুল জাবির' নামটি বর্তমানে বিকৃত হয়ে 'এলজেব্রা' নামে ব্যবহৃত হচ্ছে। এভাবে খারিজমীর প্রকৃত নাম ও আবিষ্কার আড়ালে পড়ে যায়। কেবল ইংরেজী পণ্ডিত এফ. রোজেনই গ্রন্থটির অনুবাদ করে 'মোহাম্মদ বিন মূসার এলজেব্রা' নামকরণ করেছিলেন। তার গণিত বিষয়ে অন্য এক গ্রন্থ 'আজজাম ওয়াত্ তাফরীক' ল্যাটিন ও ইংরেজীতে অনূদিত হয়। কিন্তু এখানেও আল খারিজমী নাম বিকৃত হয়ে 'আল গরিতমী' হয়ে যায়। স্মর্তব্য, বীজগণিতের যে লগারিদম শাখা আছে তা এই আল গরিতমী থেকেই উৎপত্তি হয়েছে।

আল খারিজমীর গণিত প্রতিভা বিশ্ববিশ্রুত। একজন ঐতিহাসিক লিখেন, 'সর্বযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও তার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক খারিজমী গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ভূগোলশাস্ত্রে স্থায়ী অবদান রেখে গেছেন। গণিতবিদ হিসেবে পৃথিবীর গণিতশাস্ত্রের ইতিহাসে তিনি অক্ষয় কীর্তির দাবীদার। নিঃসন্দেহে তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভার অধিকারী গণিতবিদদের অন্যতম'।

গ্রীক ও হিন্দুদের গাণিতিক জ্ঞানকে খারিজমী রূপদান করেন। তিনিই প্রথম গণিতশাস্ত্রে 'শূন্য' (Zero)-র ব্যবহার করেন। তার পূর্বে এই ব্যবহার জানা ছিলো না। অক্ষরের পরিবর্তে শূন্যসহ অন্যান্য সংখ্যার ব্যবহার প্রথম তিনিই প্রচলন করেন। বলা নিস্প্রয়োজন যে, তার মাধ্যমেই ইউরোপ শিখেছিল বৈপ্লবিক আবিষ্কার এই শূন্যের ব্যবহার। ভারতীয় গণনা পদ্ধতির উপর তার গ্রন্থ বাথের এডোলার্ড কর্তৃক দ্বাদশ শতকে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। তিনি হিসাবুল জাবির ও হিসাব গণনা এবং সমীকরণের ৮০০ উদাহরণ উপস্থিত করেন। আরবদের নিকট না-সূচক চিহ্ন প্রবর্তন করেন।

www.pathagar.com

ক্রিমেনার জিরার্ড খারিজমীর গ্রন্থ ল্যাটিনে অনুবাদ করেন। রবার্ট চেস্টারের অনুবাদের মাধ্যমে ইউরোপীয়রা এর সাথে পরিচিত হন এবং উন্নতি সাধন করেন। একজন আধুনিক পণ্ডিত লিখেছেন, 'খারিজমীর বীজগণিতের যে অনুবাদ রবার্ট ল্যাটিন ভাষায় করেছেন তার গুরুত্বকে অতিরঞ্জিত করা যায় না। কারণ এটাই ইউরোপীয় বীজগণিতের নবযুগের সূচনা করেছিল'। ঐতিহাসিক হিট্টি উল্লেখ করেন, 'দ্বাদশ শতাব্দীতে ক্রিমেনার জিরার্ড কর্তৃক আল খারিজমীর গ্রন্থ ল্যাটিনে অনূদিত হয় এবং তা ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। তা ইউরোপে বীজগণিত বা আল জেবরা নামটি প্রবর্তিত করেছিল। খারিজমীর গ্রন্থ পাশ্চাত্য তার নামানুসারে 'আল গরিজম' (Al gorism) নামক আরবী সংখ্যার প্রবর্তন করে'। জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাথেও খারিজমীর অবদান জড়িয়ে রয়েছে। সৌরঘড়ি এবং পদার্থ বিজ্ঞানে উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্র আবিষ্কার তার অবিস্মরণীয় কীর্তি। তার নির্ঘণ্ট বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ মাসলামা আল আজরিতি কর্তৃক পরিবর্তিত ও এডেলার্ড কর্তৃক ল্যাটিনে অনূদিত হলে তার উপরে ভিত্তি করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে প্রচুর গ্রন্থ বিরচিত হয়।

খারিজমীর পূর্বে গ্রীক বিজ্ঞানী ডফেন্ট এবং ভারতবর্ষে বীজগণিতের যে সীমিত চর্চা ছিলো তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ বেরিয়ে এসেছেন। ভারত ও গ্রীক প্রভাবের উপরে ছাপিয়ে উঠেছে তার মৌলিকতার সিঁড়ি। Cajori Bossault, Cardan, Wallis প্রমুখ তা স্বীকার করেছেন। আল খারিজমী তার রচনায় বীজগণিতের সমস্ত সূত্র, নানা প্রকার গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান খুব সুশৃঙ্খলভাবে তুলে ধরেছেন। পাঁচ ভাগে বিভক্ত গ্রন্থের প্রথম ভাগে আলোচিত হয়েছে বৈজ্ঞানিক দ্বিতীয় মাত্রা সমীকরণের (Quadratic equation) সমাধানের নিয়ম। কোনো প্রমাণ না দিয়ে তিনি এ সমীকরণকে ৬ ভাগে বিভক্ত করেছেন। {(1) $ax=bx$, (2) $ax^2=c$ (3) $ax^2+bx=c$, (4) $ax^2+c=bx$, (5) $ax^2=bx+c$, (6) $ax+c=bx^2$} এ প্রকার সমীকরণের দু'টি সমাধান হয় বলে তিনি প্রমাণ পেশ করেছেন। গ্রীকরা শুধু একটি মাত্র সমাধান হয় বলে ধরে নিয়েছিলেন। এটা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক যে, যখন দু'টি

www.pathagar.com

root ই positive তখন তিনি মাত্র যে root টি radical এর negative value থেকে উদ্ভূত সেটিই গ্রহণ করেছেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে বৈজ্ঞানিক সমীকরণগুলোর জ্যামিতিক প্রমাণ এবং তৃতীয় ভাগে $(x \pm a)$ এবং $(x \pm b)$ -এর গুনফল সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। চতুর্থ ভাগে উল্লেখ করেছেন– যে সকল অঙ্কে অজ্ঞাত সংখ্যা, তার বর্গ, বর্গমূল ইত্যাদি রয়েছে সেগুলোর যোগ, বিয়োগ, বর্গমূল বের করার নিয়মসমূহ এবং এসব থেকেই $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2b}$ এর $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ এই সূত্রের উদ্ভাবন, আর পঞ্চম তথা শেষ পরিচ্ছেদে তিনি কতগুলো সমস্যার সমাধান করেছেন। আল খারিজমীর একটি বৈশিষ্ট্য হলো তিনি সমস্ত প্রতিজ্ঞাগুলোই জ্যামিতিক অঙ্কনের মাধ্যমেই সমাধান দিয়েছেন। চিত্র ও বর্গের সাহায্যে এই আলোচনা তার অগাধ প্রজ্ঞার প্রমাণ বহন করে। ভারতীয় বীজগণিত খারিজমীর ভিত্তি বলে যারা সন্দেহ প্রকাশ করেন এই পদ্ধতি তাদের জবাবের জন্য যথেষ্ট। ভারতীয় বীজগণিতের সকল কাজ সংখ্যা নিয়ে, জ্যামিতিক অঙ্কনের নাম গন্ধও তাতে পাওয়া যায় না। ভারত এবং আরব গণিতের মূল পার্থক্য ধরিয়ে দিয়ে Roder বলেছেন, 'The Hindus were more analytical then the Arabs, less pure geometers; they had in addition the idea of double sign; they transfer more easily a term from one side of an equation to the other, method with them is thus beginning to generalise. It must however, be recognised that as regards exposition their language, pompous and encumbered by its verse form, has not the clearness, exactness and scientific simplicity of that of the Arab'.

জ্যামিতিক বীজগণিতের সমস্যা সমাধানে যেমন ব্যবহার করা হয়েছে বীজগণিতকে, এমনকি শুদ্ধ গণিতকেও জ্যামিতির সমস্যা সমাধানের জন্য টেনে নেয়া হয়েছে। প্রাচীন গণিতবিদের পাটিগণিত, বীজগণিত এবং জ্যামিতিকে ভিন্ন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই গণিত বিজ্ঞানে জাতিভেদ প্রচলন করেছিলেন। আর এ থেকে খারিজমী প্রমুখ বিজ্ঞানী গণিতকে মুক্ত করেন।

www.pathagar.com

Encyclopaedia of Islam লিখেছে– 'In the use of Arithmetic and Algebra in Geometry and vice versa, the solution of Algebraic problems with the aid of Geometry, the Arabs far outstripped the Greeks as well as the Indians. To the Arabs is due the honour of having recognised and emphasised as an obstacle the strict distinction between arithmatical (discontinuous) and geometrical (continuous) magnitude which had so severely impeded the fruitful development of Mathematics among the Greeks'.

এছাড়া আল খারিজমী পরিমিত (Menusration) এবং পরিমিতভাবে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত, পিরামিড প্রভৃতির আয়তন, পরিধি ইত্যাদি নিরূপণের প্রণালী নিয়ে আলোচনা করেছেন এই গ্রন্থে। তার মতে, বৃত্তের ব্যাসকে (Dlameter) ৩x১/৭ দিয়ে গুন করলে পরিধি পাওয়া যাবে; বৃত্তের পরিধির অর্ধেককে ব্যাসের অর্ধেক দিয়ে গুন করলেই বৃত্তের আয়তন (Area) পাওয়া যাবে কেননা প্রত্যেক সমবাহু ও সমান কোণ বিশিষ্ট বহুভুজই যথা ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, পঞ্চভুজ প্রভৃতির আয়তন, সেই বহুভুজেরই মধ্যবৃত্তের ব্যাসের অর্ধেককে পরিধির অর্ধেক দিয়ে গুন করলেই পাওয়া যায়। যদি কোন বৃত্তের ব্যাসকে বর্গ করে তা থেকে ১/৭ অংশ এবং ১/৭ অংশের ১/২ বাদ দেয়া যায় তাহলেও একই ফল পাওয়া যাবে। অর্থাৎ বৃত্তের আয়তন হলো :

আয়তন = (ব্যাস)^২ = ২২/৭x৪ (ব্যাস)^২ = (১+১/৭-১/২) (১/৭) (ব্যাস)^২।

শুদ্ধ জ্যামিতির সমতল ও বৃত্ত অঙ্কন সম্পর্কে খারিজমীর গ্রন্থ ইউরোপের অনেক লাইব্রেরিতে এখনো বিদ্যমান আছে। জ্যামিতিকে তিনি কত সহজবোধ্য করে তুলেছিলেন তা জানা যায় John Bossut-এর কথায়। তিনি A General History of Mathematics (1803) গ্রন্থে লিখেন : Practical Geometry and Astronomy owe the Arabs eternal gratitude for having given to Trigonometrical calculation the simple and the commodious forms which it has at present. They reduced the theory of the resolution of triangles, both rectilinear and

www.pathagar.com

spherical, to a small number of easy propositions and by the substitution of sines which they introduced instead of the chords of the double ares employed before, they made abridgements in calculations, of inestimable value to those who had a great number of triangles to resolve these discoveries are embodied chiefly to a geometrician and astronomer of the name Muhammad Bin Musa, the author of a work still extant, entitled of 'plane and spherical figures'

বিখ্যাত গবেষক গিলস্পাই এর মতে, তার রচনায় জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক বিভিন্ন নিরীক্ষা ও নির্দেশনা সুশৃঙ্খল ছকের মাধ্যমে উপস্থাপিত। বলা হয় তার রচনায় টলেমীর গবেষণার প্রভাব রয়েছে। খারিজমী চন্দ্র, সূর্য ও তখনকার আমলে জানা পাঁচটি গ্রহের গতিবিধির চমৎকার ছক তুলে ধরেছেন। এছাড়া চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ, সূর্যের উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ণ, ঋতু পরিবর্তন প্রভৃতির হিসাব সম্বলিত ছকসমূহও তিনি আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করেছেন এবং বিভিন্ন ত্রিকোণমিতির হিসাবও এসেছে তার রচনায়। গিলস্পাই এর মতে, খারিজমীর রচনায় টলেমীর প্রভাব থাকলেও স্বীকার করতে হয় তার রচনায় জ্যোতির্বিদ্যার সহায়তাও নিয়েছিলেন। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থ 'ব্রম্মস্পুতি সিদ্ধান্ত' থেকে তিনি বেশি উপকৃত হয়েছেন।

খারিজমী আবহাওয়ার শ্রেণী ভিত্তিতে ৬ ভাগের যে ভৌগোলিক শ্রেণী বিন্যাস করেছেন তার প্রথমভাগে আছে বিভিন্ন শহর নগর, দ্বিতীয় ভাগে পর্বতসমূহ, তৃতীয়ভাগে সাগর-মহাসাগর, চতুর্থভাগে দ্বীপসমূহ, পঞ্চমভাগে বিভিন্ন ভৌগলিক এলাকার কেন্দ্রীয় অঞ্চলসমূহ এবং ষষ্ঠভাগে রয়েছে নদ-নদীসমূহের বিস্তারিত বিবরণ। Astrolabe বা গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান মাপার যন্ত্রবিশেষের উপর তার দু'টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এছাড়া এসব যন্ত্রের ব্যবহার বিধি সম্পর্কে তার 'কিতাবুল আমল বিল আস্তারলব' নামক আরেকটি গ্রন্থ আছে। এছাড়া তিনি সূর্যঘড়ির উপর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

www.pathagar.com

খলিফা মামুনের দরবারে খারিজমীর আবিষ্কার তার দরবারের অন্যান্য বিজ্ঞানীদের খ্যাতি ম্লান করে দিয়েছিল। আল্লামা শিবলী 'আল মামুন' গ্রন্থে লিখেছেন, 'নতুন তথ্যানুসন্ধানের পরে মামুনের দরবারে বিখ্যাত জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদ আবু জাফর মুহাম্মদ বিন মূসা খারিজমী যে জ্যোতিষশাস্ত্রের পুস্তক প্রণয়ন করলেন তার জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি আগেরকার সব পুস্তকের খ্যাতি ম্লান করে দিলো। এ গ্রন্থ দুনিয়ার যতসব নির্ভরযোগ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের পুস্তক অবলম্বনে লেখা হয়েছে, ভারতের গ্রন্থের সাথে এর মিল রয়েছে। পারস্যে রচিত গ্রন্থাবলীর সাথেও এর যোগ আছে। বাতলিমুসের অভিমতও এতে স্থান পেয়েছে।'

একজন বিশিষ্ট ভূগোলবিদ হিসেবে মূসা আল খারিজমী স্মরণীয়। তার রচিত গ্রন্থই আরবীতে ভূ-বিজ্ঞানের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করে। তার সূরাতুল আরদ নবম শতকের প্রথমার্ধে রচিত। অধ্যাপক মিনরস্কি বলেন, ইউরোপীয়গণ তাদের বিজ্ঞান চর্চার প্রথমদিকে তার সমতুল্য গ্রন্থ রচনা করতে পারেনি। খারিজমী ছিলেন ইসলামের প্রথম যুগের মানচিত্র প্রস্তুতকারীদের অন্যতম। মামুনের দরবারের যে সকল মনীষী পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করেন তিনি তাদের অন্যতম। এই মানচিত্রে পৃথিবীকে সাতটি ভূখণ্ডে বিভক্ত করা হয়। মামুনের নিকট যে সকল মানচিত্র উপস্থাপন করা হয়েছিল তার মধ্যে খারিজমীর মানচিত্রই উত্তম বলে গৃহীত হয়েছিল। উল্লেখ্য পৃথিবীর একটি পরিমাপও তিনি করেছিলেন।

অসাধারণ প্রতিভার স্মারক এই মহান বিজ্ঞানী ৮৪৭ ঈসায়ী সনে ইন্তেকাল করেন। মুসলিম সভ্যতার অগ্রসেনানী খারিজমী সহস্র বছর পরও সভ্যতার কর্মী হিসেবে স্মরিত, বরিত ও নন্দিত। তার স্মরণ আজ মুসলিম গবেষণার ঝিমিয়ে পড়া আগ্রহ ও উৎসাহকে নতুনভাবে নাড়া দিক এটাই সবার কামনা।

www.pathagar.com

গণিতবিদ আবু রায়হান আল বিরুনী

আজকের ইরানকে সেকালে বলা হতো পারস্য। সে দেশে তখনকার 'খারিজম' (আর বর্তমান 'খিভা') নামক এক প্রদেশ ছিলো। ফার্সী ভাষাতে শহরতলী ও রাজধানী সংলগ্ন জেলাকে বলা হয় 'বিরুন'। এই খারিজম প্রদেশের রাজধানীর শহরতলীতে এক অখ্যাত অনভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন মোহাম্মদ ইবনে আহমদ। তিনি নিজের নাম লিখতেন 'আবু রায়হান'। তবে সারা বিশ্বে তিনি আল-বিরুনী নামে বেশি পরিচিত। পূর্ণ নাম আবু রায়হান মোহাম্মদ বিন আহমদ আল বিরুনী। তার বাল্যকাল, শিক্ষাজীবন সম্পর্কে তেমন বেশি কিছু জানা না গেলেও তার এক লেখা থেকে বুঝা যায়, তিনি ৩৬১ হিজরীর ৩ যিলহজ ইংরেজী ৯৭৩ ঈসায়ী সনে ৩ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার জন্মগ্রহণ করেন।

আল বিরুনীর পিতা ছিলেন গরিব। তাই সুখ দিয়ে তার জীবন শুরু হয়নি। তার উপর তিনি বালক অবস্থায় মাতা-পিতা উভয়কে হারিয়ে আরো অসহায় হয়ে পড়েন। তবে কোন এক কারণে তিনি বাল্যকালেই ইরাক বংশীয় নৃপতি আল মনসুরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তার লেখাপড়া ও অমূল্য প্রতিভা বিকাশে তাদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। রাজকীয় অনুগ্রহের মাঝে থেকেই তিনি জীবনের প্রথম বাইশ বছর কাটান। রাজকীয় বিশাল লাইব্রেরিতে সারাক্ষণ নানা রকম দুষ্প্রাপ্য ভালো গ্রন্থসমূহ তিনি আত্মস্থ করে ফেলেন। এর কিছুদিন পর আল বিরুনীর পৃষ্ঠপোষক নৃপতি রাজনৈতিক গোলযোগে নিহত হলে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন এবং দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে খারিজম ছেড়ে চলে যান। জুরজান ছিলো কাস্পিয়ান সাগরের তীরে অবস্থিত বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানী আবুল ওয়াফার দেশ। আবুল ওয়াফার যখন অন্তিমকাল ঘনিয়ে এসেছে ঠিক সে সময়ে আল বিরুনী স্বদেশ ছেড়ে জুরজানে চলে যান। সেখানে পৌঁছে তিনি স্বস্তি ফিরে পান এবং আবার জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় ডুবে যান। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই জুরজানের শাসক প্রচণ্ড বিদ্যোৎসাহী কাবুসের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন। ফলে আল বিরুনীর জীবনে আবার ফিরে আসে সোনালী দিন। এমনকি কাবুস তার প্রতি এতই মুগ্ধ হন যে, রাজ্যের অর্ধেক তাকে দিয়ে দেবার প্রস্তাব দেন। কিন্তু পার্থিব

www.pathagar.com

সম্পদের প্রতি নির্লোভ আল বিরুনী সে প্রস্তাবে রাজী হননি। তবে কাবুসের এমন ভালোবাসার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আল বিরুনী তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দু'টি গ্রন্থ 'আল আসরারুল বাকিয়া আনাল কুরুনিল আলিয়া ও তাজরীদুশ শুয়াত' রাজার নামে উৎসগ করেন। প্রথমটিতে গাণিতিক পদ্ধতি ব্যবহার ছিলো সম্পূর্ণ নতুন সংযোজন। এম আকবর আলী জানিয়েছেন– 'সমস্ত গ্রন্থখানি ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ নিয়ে বৈজ্ঞানিক গণনায় ভরপুর। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন গ্রন্থের সংখ্যা অতীব বিরল। মধ্য এশিয়ার নানা জাতির মধ্যে প্রচলিত বা অধুনা বিলুপ্ত বর্ষ গণনা পদ্ধতি, পর্বাদি, ধর্ম-কর্মের নিয়মকানুন ইত্যাদির এমন বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা আল বিরুনী ছাড়া অন্য কেউ করেছেন বলে জানা যায় না। কোন উৎসাহী অনুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিক এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করলেও এর চেয়ে বিশেষ কিছু উন্নতি করতে পারবেন বলে মনে হয় না। আল বিরুনী যে সমস্ত উৎস ব্যবহার করেছেন তা বর্তমানে যে কোন লেখকের আয়ত্তের বাইরে। সে হিসেবে এর মৌলিকত্ব যে চিরকালের জন্য অবিনশ্বর রয়ে যাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই'।

জুরজানে পরম সম্মানে থাকলেও জন্মভূমি খারিজমের মায়া তিনি কিছুতেই ছাড়তে পারেননি। চলে আসেন মাতৃভূমিতে। এসেই তথাকার নৃপতি আল মামুনের সভ্যতে পরিণত হন। এর কিছুদিন পর গজনীর সুলতান মাহমুদের চিঠি পেয়ে তিনি সেখানে যান এবং তার দরবারে অসামান্য মর্যাদা লাভ করেন।

কিছুদিন গজনীর রাজ দরবারে থাকার পর তিনি তার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাবুল হিন্দ'-এর তথ্য ও মাল-মশলা সংগ্রহের জন্য ভারতে আসেন। এ সময় গজনীপতি মাহমুদ মারা গেলে এক সংঘর্ষের পর তার পুত্র মাসউদ সিংহাসন দখল করেন। আল বিরুনীর প্রতি সুলতান মাসউদের অপরিসীম শ্রদ্ধাবোধ ছিলো। এ সময় তিনি 'কিতাবুল হিন্দ' রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। পরে সুলতান মাসউদের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'কানুনে মাসউদী' রচনা করেন। মাসউদ এতে খুশি হয়ে বিরুনীকে এক হস্তী পরিমাণ রূপা উপঢৌকন দেন। কিন্তু নির্লোভ বিজ্ঞানী তা রাজকোষে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

'কানুনে মাসউদীর' চতুর্থ খণ্ডে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করা

www.pathagar.com

হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের মধ্য দিয়েই তিনি ত্রিকোণমিতিকে উচ্চস্তরে উন্নীত করার কাজে প্রভূত কৃতিত্ব দেখান। সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ গণনায় তিনি যে নিয়ম ব্যবহার করেছিলেন তা শুধু সে যুগেই নয় তারপরও অনেকদিন বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে। তার গণনারীতির এই থিওরি হলো– 'The Formula of Interpolation' যা আজ নিউটনের আবিষ্কার বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে! অথচ নিটনের জন্মের বহু পূর্বেই আল বিরুনী তা শুধু আবিষ্কারই করেননি বরং একে ব্যবহার করে দেখান। তিনি প্রথমত ০ ডিগ্রী থেকে ৯০ ডিগ্রী সাইনের মূল্য নির্ধারণ করে একটি বিশুদ্ধ Sine table বা সাইন সারণীও তৈরি করেন। তার পূর্ববর্তী তালিকাগুলো হতে এর পার্থক্য হলো, তিনি কেবল প্রত্যেক ডিগ্রীর সাইন-ই নির্ধারণ করেননি, প্রতিটি ডিগ্রীর অংশের সাইন নির্ধারণ করেছেন। কোণকে সমত্রিখণ্ডিত করার সমস্যার সম্মুখীন তিনিও হয়েছিলেন। এর গাণিতিক সমাধান অসম্ভব জেনেই তিনি চেষ্টা করে ১২টি যান্ত্রিক (Mechanical) উপায় নির্ধারণ করেন যাতে তার অসামান্য প্রতিভার পরিচয় ফুটে উঠেছে। এভাবে তিনি ১ ডিগ্রীর চাপের যে পরিমাণ নির্ধারণ করেন তা দশমিকের দশম স্থান পর্যন্ত শুদ্ধ। এ পরিমাণটি হলো : $1g2^{i}\text{-}49^{ii}\text{-}51^{iii}\text{-}48^{iv}$. আর বর্তমানে বিশুদ্ধ বলে স্থিরকৃত পরিমাণ হলো : $1g2^{i}\text{-}49^{ii}\text{-}51^{iii}\text{-}48^{iv}\text{-}0^{v}\text{-}25^{vi}\text{-}27^{vii}$. তিনি তার সাইন তালিকা এত সূক্ষ্মভাবে গণনা করেছেন যে, এতে ভুলের পরিমাণ এক দশমাংশের চেয়েও কম এবং তার সূত্রানুযায়ী নির্ণীত মূল্যে তিন দশমাংশেরও কম ভুল হয়। বলা প্রয়োজন যে, বর্তমানেও এর চেয়েও সূক্ষ্মতর গণনা হয়নি এবং কোনো বৈজ্ঞানিক গণনাতেই আঙ্কিক বিশুদ্ধ মান নেয়া হয় না।

সমতলিক মণ্ডলাকার ত্রিভুজের সমাধানের জন্য তিনি সূত্র উদ্ভাবন ও সেগুলো প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যত্নবান ছিলেন। এতে সর্বপ্রথম ফর্মূলা SinA/a= SinB/b অনেক পরিশ্রম করে তিনি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপন করেন। তার এই কাজের প্রভাব পড়েছে পরবর্তীকালে শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ নাসির উদ্দীন তুসীর কর্মে। আল বিরুনীর বেশ কিছু উদ্ভাবিত ফর্মূলা নাসির উদ্দীন তুসীর আবিষ্কার বলে চালানো হয়। ত্রিভুজের ৬টি কৌণিক সম্বন্ধের ৪টি গ্রীকরা আবিষ্কার করে, বাকি ২টি আবিষ্কার করেন আল বিরুনী। তা হলো :

$$CosA=CosA\ SinB$$

www.pathagar.com

$$CosC=CotA\ CotB$$

আল বিরুনীর বিরাট পাণ্ডিত্যের অনেকখানিই বহু শতাব্দী যাবত আধুনিক বিশ্বের নজরে কুয়াশা সৃষ্টি করেছিলো। প্রফেসর সাখাও এবং Ramsay Wright এর অনুবাদ প্রকাশের পর চতুর্দিকে বিশ্বের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বর্তমান দুনিয়ার সর্বত্রই তার কার্যাবলীর আলোচনা হচ্ছে। ইউরোপে International Congress of Orientalist ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে প্যারিসে ২১তম অধিবেশনে তার জন্ম সহস্র বার্ষিকী পালন করে। কানুনে মাসউদীর আলোচনায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে Obliquity of the Ecliptic (ক্রান্তিবৃত্তের আনত) তার প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চন্দ্রের লম্বন বা Parallex of the Moon আলোচনার মধ্যেও তিনি প্রথমে নিজ গণনারীতি অনুসরণ করে অগ্রসর হয়েছেন।

দ্রাঘিমা, অক্ষরেখা, সূর্যাস্ত, সূর্যোদয়, দিক নির্ণয় ও গ্রহ নক্ষত্রাদির অবস্থান জ্ঞাপক সংজ্ঞা নির্ণয়ে গ্রন্থের অধিকাংশ ব্যয় হয়েছে। স্থানাঙ্কের যে কোনো দুইটি বিষয় জানতে পারলে অন্যগুলো নির্ধারণ করার যে ফর্মূলা তিনি বাতলে দিয়েছেন তার প্রথম আবিষ্কারের গৌরব আল বিরুনীর নিজের। তার এ অমর আবিষ্কার জ্যোতির্বিজ্ঞানকে এক অমোঘ মুক্তিবাণীর সন্ধান দিয়েছিলো। তার পরবর্তী সকল বিজ্ঞানীই এই সূত্রের ঢালাও ব্যবহার করেছিলেন। এই সময়কার বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ উলূঘ বেগ আল বিরুনীর ভাষা, ভাববিন্যাস হুবহু অনুকরণ করতেও দ্বিধা করেননি। একাদশ শতাব্দীর পূর্বে আল বিরুনীই প্রথম কানুনে মাসউদীতে পৃথিবীর গতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। বর্তমানে বিজ্ঞান গ্রন্থগুলোতে Helio centric মতবাদকে কোপার্নিকাসের আবিষ্কার বলে চালানো হচ্ছে। অথচ এর তিনশ বছর আগে রচিত আল বিরুনী ও আজ্ জারকালি প্রমুখ মুসলিম বিজ্ঞানীদের গ্রন্থে তার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। সারাবিশ্বের বিদ্বান ও উচ্চ মহলে আল বিরুনীর যথেষ্ট খ্যাতি ছিলো। তিনি গণিত, জ্যোতিষ, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, ভূগোল, প্রকৃতি বিজ্ঞান, দর্শন, ভূতত্ত্ব, চিকিৎসা ও রসায়নসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসংখ্য বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন। আল-বিরুনী স্থানের দূরত্ব ও অবস্থান, নগরের আয়তন গণনা সম্পর্কীয়, আলো ও গতি সম্পর্কীয়, কাল ও সময়, জ্যোতির্বিজ্ঞান, আকায়েদ, কাহিনী, কৌতুক, ইতিহাস ও বিবিধ বিষয়ে

www.pathagar.com

শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে ১১ খণ্ডে বিভক্ত অসমাপ্ত 'কানুনে মাসউদী' কয়েকটি পাণ্ডুলিপি বৃটিশ, বার্লিন ও ইস্তাম্বুলের মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। এ বিশালগ্রন্থ ও 'কিতাবুল হিন্দ' গ্রন্থগুলোই তার খ্যাতির ও বৈজ্ঞানিক পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট। ভারতের ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি নিয়ে তার অবিস্মরণীয় রচনা 'কিতাবুল হিন্দ'। ভারতীয় সংস্কৃতি নিয়ে এ রকম বৈজ্ঞানিক ইতিহাস সর্বপ্রথম। আল বিরুনীই সর্বপ্রথম Scientific Indiologist. ড. সুনীতি কুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে– সর্বপ্রথম কেবল নয়, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠদের অন্যতম। তিনি বলেন, 'Al-Biruni is distinguished as one of the greatest scholars of medieval time, a polymath who was equally at home in mathematics and theology, astronomy and philosophy, chemistry and chronology, history and ethnography, and medicine and cosmography and whose special preeminence was that he was the first of Scientific Indiologists and one of the greatest of all time.

আজ ভারতের যে কোনো ধরনের প্রামাণিক ইতিহাস রচনায় 'কিতাবুল হিন্দু' একটি অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। আল বিরুনীর শতাধিক গ্রন্থের মধ্যে এ একটি গ্রন্থই তার অমরত্ব এবং প্রজ্ঞার পরিচয় হিসেবে যথেষ্ট। ইতিহাসকে দার্শনিক দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ইবনে খালদুন আর তারও পূর্বে প্রায় তিনশত বছর পূর্বে ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক গণনা পদ্ধতি ব্যবহার করে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন খারিজমের সন্তান আল বিরুনী। 'কিতাবুল হিন্দের' জন্য তাকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভূগোলবিদ বলা হয়। তিনিই সর্বপ্রথম পৃথিবীর গোলাকার মানচিত্র তৈরি করেন এবং 'কিতাবুত তাফহীম'-এ এর ব্যাখ্যা লিখেন। বিশ্বের বহু ধর্ম ও ভাষার উপর তার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিলো। তিনি আল্লাহর উপর অবিচল বিশ্বাস রাখতেন। এটিই তার সমস্ত খ্যাতি ও গবেষণার উৎস ছিলো।

দুনিয়ার অন্যতম ও সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ এ বিজ্ঞানী ১০৫০ ঈসায়ী সনে ইন্তেকাল করেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন। তিনি বলতেন, 'গ্রন্থাদিই হচ্ছে আমার সন্তান-সন্ততি ও উত্তরাধিকার'।

www.pathagar.com

দার্শনিক ও বিজ্ঞানী আল কিন্দি

গৌরবময় যুগে মুসলিম দুনিয়ায় শত শত কালজয়ী বিজ্ঞানীদের আবির্ভাব ঘটেছিল। হাজার বছরের মুসলিম শিক্ষা ও বিজ্ঞানকে এরাই মহিমামণ্ডিত করেছিলেন। এসব স্থপতি ও পুরোধাগণের অধিকাংশই ছিলেন অনারব বংশোদ্ভূত। খাঁটি আরবদের মধ্যে খুব কম প্রতিভাই জন্ম নিয়েছিল। যদিও এই আরবই পুরো মুসলিম ও ইসলামী তাহজীব তমদ্দুনের কেন্দ্রপীঠ ছিলো এবং আরবী ভাষাতেই চর্চা ও গবেষণা পরিচালিত হতো। মুসলিম আরব বংশোদ্ভূত সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিভাবান বিজ্ঞানী ও দর্শনবিদ ছিলেন আল কিন্দি। প্রখ্যাত আইন বিশারদ গাজী শামছুর রহমান ছোট্ট এক প্রবন্ধে লিখেছেন : 'আরবীয়দের মধ্যে নাম করা কোন বৈজ্ঞানিকের সন্ধান তেমন পাওয়া যায় না এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম শুধু আল কিন্দি। খাঁটি আরবী হিসেবে বিজ্ঞান জগতে তার আগমন ঘটে'।

আল কিন্দির পুরো নাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইসহাক আল কিন্দি। ৮০১ ঈসায়ী সনে জন্মগ্রহণ করেন কুফায়। তার জন্মসাল নিয়ে মতভেদ আছে। পিতা ইসহাক বিন সাব্বাহ ছিলেন খলিফা হারুনুর রশিদ ও মেহেদীর অধীনে কুফার শাসনকর্তা। পূর্বপুরুষরা কিন্দা অঞ্চলের লোক ছিলেন বলে তিনি কিন্দি নামে পরিচিত হন। আল কিন্দি নামটি আবার আল কিন্দিয়াসে পরিবর্তিত হয়ে যায়। তবে তিনি 'দি ফিলোসফার অব আরব' বা 'আরবদের দার্শনিক' নামে সর্বাধিক পরিচিত।

ঐতিহাসিক আমীর আলী উল্লেখ করেছেন যে, আল কিন্দি বসরা ও বাগদাদে শিক্ষা লাভ করেন এবং খলিফা মামুন ও মুতাসিমের অধীনে বহুমুখী প্রতিভা বিকাশে সিদ্ধি লাভ করেন। তিনি ছিলেন, গ্রীক, পারসিক ও ভারতীয় ভাষার সুপণ্ডিত আর এসব ভাষার দর্শন সম্পর্কে পাণ্ডিত্যের অধিকারী। জ্ঞান বিজ্ঞানের অসংখ্য বিষয়ের উপর তিনি পারদর্শী ছিলেন। কিন্দি ছিলেন একাধারে দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ, রসায়নবিদ, গণিতবিদ, চিকিৎসা বিজ্ঞানী,

www.pathagar.com

রাজনীতিক এবং সঙ্গীতজ্ঞ। এসকল বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। দর্শন পিতা এরিস্টটলের গভীর প্রভাব বর্তেছিল যে সকল মুসলিম দার্শনিকদের উপর আল কিন্দি তাদের প্রথম জন ছিলেন। আব্বাসীয় দরবারে তিনি যখন গ্রীক গ্রন্থের আরবী অনুবাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন প্রথমেই অনুবাদ করেন 'Theology of Aristotle' বা 'এরিস্টটলের ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থটি। সরকারী ব্যবস্থাপনায় অন্যান্য অনুবাদের কাজও তিনি তত্ত্বাবধান করতেন। তিনি রাজ দরবারে জ্যোতির্বিদ, চিকিৎসক এমনকি রাজস্ব প্রশাসক হিসেবেও কাজ করেছিলেন।

আরব দার্শনিক হিসেবে কিন্দি ছিলেন অত্যন্ত পরিচিত। ঐতিহাসিক মুহম্মদ রেজা-ই-কারীম উল্লেখ করেন, 'দর্শন তত্ত্বের দিক দিয়ে আরবদের মধ্যে তিনিই এরিস্টটলের একমাত্র শিষ্য। তিনি এরিস্টটল এবং প্লেটোর দর্শনের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে পীথাগোরাসের অঙ্কশাস্ত্রকেই সকল বিজ্ঞানের ভিত্তি বলে মত প্রকাশ করেছেন।... তিনি প্রায় দুইশত পয়ষট্টিটি পুস্তক লিখেছিলেন বলে জানা যায়'। শিবলী নোমানী লিখেন, 'ইয়াকুব কিন্দি ছিলেন (খলিফা মামুনের) দরবারের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক। মুসলমানদের ভেতরে তিনি এরিস্টটলের সমকক্ষ বলে বিবেচিত হতেন। সোলায়মান বিন হান্নান লিখেছেন যে, ইসলাম জগতে কিন্দি ভিন্ন আর কেউ দার্শনিক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেননি।... আল্লামা ইবনে আ'সবী'আ তার রচিত 'তবকাতুল আতিব্বা' গ্রন্থে কিন্দির রচনাবলীর এক ফিরিস্তি দান করেছেন। তাতে দু'শ বিরাশিটি গ্রন্থ ও পুস্তিকার নাম রয়েছে। তার কতিপয়ের ভেতরে তিনি গ্রীক দার্শনিকদের ভুল-ভ্রান্তি খতিয়ে দেখেছেন'।

কিন্দির গ্রন্থ সংখ্যা নিয়ে কোন ঐকমত্য নেই। 'এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা' ২৭০টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছে। অধ্যাপক কে আলী লিখেন, তিনি কমপক্ষে ৩৬১টি গ্রন্থ রচনা করেন। কোন গ্রন্থই মূল ভাষায় পাওয়া যাবে না। তবে ক্রিমোনার জিরার্ড কর্তৃক ল্যাটিনে অনূদিত কিছু গ্রন্থ এখনও প্রচলিত আছে। ব্রিটানিকার তথ্য মতে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর এ পর্যন্ত তাঁর দু'টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাহলো, 'কিতাবু ফি কিমিয়া আল

www.pathagar.com

ইতর ওয়াত্ তাসিদাত' এবং 'আকরাবাদিন'। বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁর রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, Analytica, Categories, Apology of Aristotle, Almagistia of Ptolemxy, The Elements of Euclid, Theology of Aristotle, History of Aristotle, The Essentials of Knowledge in Music, On the Melodies and the Necessary Book in Composition of Melodies.

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে কিন্দি ছিলেন গ্রীক দর্শনের আরব প্রতিনিধি। তার মাধ্যমেই আরবে গ্রীক দর্শন পরিচিতি ও প্রসার লাভ করে। তার উদ্দেশ্য ছিলো গ্রীক দর্শনের সাথে ইসলামের সামঞ্জস্য বিধান করা। তিনি কুরআন, এরিস্টটলের দর্শন, নিও পেটোনিজম ও নিও প্যাথাগোরিয়াজমকেই দার্শনিক ভিত্তি মনে করতেন। এগুলোর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল কিন্দির দার্শনিক চিন্তাধারা। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন গণিতের জ্ঞান ছাড়া দর্শন চর্চা বৃথা। তার মতে গণিতশাস্ত্রই হচ্ছে দর্শনশাস্ত্রের উপক্রমিকা। চিকিৎসাশাস্ত্রেও তিনি গণিতের প্রয়োগ করেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে গণিতের এই প্রয়োগ চিকিৎসা ও মনোবিজ্ঞানে বহু আবিষ্কার করেন। ইউক্লিডের 'অপটিক্স' গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে রচিত তার চক্ষুশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ ইবনুল হিশামের গ্রন্থ প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এ গ্রন্থ রজার বেকনকেও প্রভাবিত করেছে। আল কিন্দি মনোবিজ্ঞানের আবিষ্কার করেন যে স্পর্শ (Sensation) এবং স্থানের (Stimulus) মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। এই মতামত মনোবিজ্ঞানের 'ওয়েবার ফকনার সূত্র' নামে পরিচিত। কিন্দি তার পূর্ণ বিকাশ করতে না পারলেও এই সূত্রের পুরোধা হিসেবে গৌরব তারই প্রাপ্য। সঙ্গীত নিয়ে তিনি গ্রন্থ লিখেন মোট সাতটি। তন্মধ্যে তিনটি সংরক্ষিত হয়েছে, যা পূর্বের তালিকায় উল্লিখিত হয়েছে। গ্রীক ধারার অনুসারী সঙ্গীত লেখকদের মধ্যে তিনি নেতৃস্থানীয় ছিলেন। তিনি সঙ্গীতের রাগ সুরের মধ্যে গাণিতিক প্রয়োগ করেছেন।

কিন্দি দর্শন শাস্ত্রে ৩৩টি, জ্যোতির্বিজ্ঞানে ৪টি, গণিতে ১১টি, ন্যায়শাস্ত্রে

www.pathagar.com

১৮টি, জ্যামিতিতে ২৭টি, জ্যোতিষশাস্ত্রে ১০টি, আকাশ বিজ্ঞানে ১৯টি, চিকিৎসা বিজ্ঞানে ২৮টি, গোলক সম্পর্কে ৮টি, মনস্তত্ত্বে ৯টি, রাজনীতি নিয়ে ১২টি, আবহবিদ্যা বিষয়ে ১০টি, ভবিষ্যৎ বাণী সম্পর্কে ১৭টি, ধর্মীয় বিতর্কমূলক ১৬ এবং আরো বিচিত্র বিষয় নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার গ্রন্থ সম্পর্কে সিডিলট মন্তব্য করেছেন, 'তার গ্রন্থগুলো অদ্ভুত আর চিত্তাকর্ষক ঘটনাপূর্ণ।' কিন্দির বিশাল প্রতিভা সম্পর্কে দার্শনিক কার্ডন 'ষোড়শ' শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণকারী সূক্ষ্মদর্শী শ্রেষ্ঠ বার জন প্রতিভার অন্যতম বলে উল্লেখ করেন'। মুসলিম চিন্তাধারার বিকাশে পরবর্তী সকলের গুরু ছিলেন তিনি। এই অসামান্য অবদানের জন্য তাকে 'মুসলিম দর্শনের' জনক বলেও গণ্য করা হয়।

১৯৬২ সালে ইরাকে আল কিন্দির সহস্রতম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে তার চিন্তা ও কর্ম নিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান চালানো হয়। অধ্যাপক ম্যাকার্থী সেই সময় তাঁর কার্যকলাপ নিয়ে একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই মহান দার্শনিক ও বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয় ৮৫০ ঈসায়ী সনে। এটা নিকলসনের মত। মাগসিসননের মতে ৮৬০ এবং নালিনের মতে তিনি ৮৭৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন। আমীর আলী উল্লেখ করেছেন ৮৪২ সালে। জানা যায়, তিনি মুতাওয়াক্কিলের রাজত্বকালে (৮৪৭-৬১ খৃ.) অবসর নিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

মনীষী ও বিজ্ঞানী ইবনে রুশ্‌দ

মুসলিম স্পেন পৃথিবীকে যে সকল বিজ্ঞানী ও খ্যাতনামা মনীষী উপহার দিয়েছিলো তন্মধ্যে দার্শনিক ও বিজ্ঞানী ইবনে রুশ্‌দ অন্যতম। স্পেনের মুসলমানদের বিজ্ঞানচর্চার প্রভাবে ইউরোপে সভ্যতার জলরাশি প্রবেশ করে। এক্ষেত্রে মুসলমানদের ইউরোপীয় সভ্যতার পথিকৃৎ নির্মাতা বলা যায়। একথা অনেক পাশ্চাত্যবিদ খ্রিস্টানই স্বীকার করে নিয়েছেন।

জগতেতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে রুশ্‌দ ১১২৬ ঈসায়ী সনে কর্ডোভায় এক উচ্চ বংশীয় কাজী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ও পিতামহ কর্ডোভার প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ইবনে রুশ্‌দ ইউরোপে 'আভিরেজ' নামে সমধিক পরিচিত।

প্রথম জীবনে ধর্মতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, আইন, দর্শন ও চিকিৎসাবিদ্যাই ছিলো তার পড়ার বিষয়। বিখ্যাত মনীষী আবু জাফর হারুনের নিকট তিনি অধিকাংশ বিষয় জানেন। তিনি ইবনে তোফায়েল (মৃত্যু : ১১৮৫ ঈসায়ী সন) এর তত্ত্বে প্রভাবিত ছিলেন বলে জানা যায়। তিনি ইমাম মালিকের অনুসারী এবং আশারীয় মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। পারিবারিক ঐতিহ্যানুযায়ী আইন ব্যবসার মাধ্যমেই তার কর্ম জীবন শুরু হয়। অবশ্য পরে জ্ঞান সাধনার লক্ষ্যে আজীবন নিজেকে নিবেদিত করেন। আইন ও চিকিৎসা শাস্ত্রে ইবনে রুশ্‌দ তৎকালীন পৃথিবী বিখ্যাত কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন এবং উভয় শাস্ত্রে খ্যাতিমান হয়ে পড়েন চতুর্দিকে। উল্লিখিত বিষয়াদি ছাড়াও তিনি কুরআন, হাদীস, ইলমুল কালাম, অঙ্কশাস্ত্র, তর্ক, ইতিহাস এবং জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। অসাধারণ বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ইবনে রুশ্‌দের পাণ্ডিত্যের কথা দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। অচিরেই তিনি শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও দার্শনিকরূপে পরিচিত হন। মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইউরোপে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেন। তাই আজো ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাসে তার চিন্তাধারা সম্মানজনকভাবে চিহ্নিত। বস্তুত সমগ্র বিশ্বের দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস তাকে বিশিষ্ট স্থান প্রদান করেছে।

ইবনে রুশ্‌দ জ্ঞানের কীট ছিলেন। দিবারাত্রের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৬ ঘণ্টাই

www.pathagar.com

তিনি লেখাপড়াতে ব্যাপৃত থাকতেন। সত্তর বছর বয়সেও পাণ্ডিত্বে তার অগাধ দখল। মূল্যবান গ্রন্থাদি পাঠের সময় তিনি নিজস্ব অভিমত লিখে রাখতেন। ফকীহ্ ও চিকিৎসা-প্রণালী শিক্ষার জন্য বড় বড় চিকিৎসকরা তার কাছে হাজির হতেন। যদিও তিনি দার্শনিক হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত। অন্যান্য বিষয়েও খ্যাতি ও কর্তৃত্ব উভয়ই লাভ করেছিলেন তিনি। চল্লিশ বছর বয়সের দিকে তিনি ফিকাহ্ ও দর্শনের দিকে অত্যধিক ঝুঁকে পড়েন। ১১৬৯ সালে মাত্র ২০ বছর বয়সে তিনি সেভিলের কাজী এবং কিছু পর কর্ডোভার কাজীরূপে নিযুক্ত হন। তিনি প্রায় ১২ বছর কর্ডোভার বিচারপতি ছিলেন। প্রায় ২৫ বছর সময়কাল গণ প্রতিষ্ঠানের উচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। খলীফা তার সাথে নিয়মিত দর্শন ও চিকিৎসা বিষয়ে আলোচনা করতেন। ইউসুফের মৃত্যুর পর আল মনসুর (১১৮৪-৯৯ ঈসায়ী সন) খলীফা হন। তিনি আবু রুশ্‌দের প্রতি যথেষ্ট প্রসন্ন ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তার সাথে বিশদ আলোচনা করতে বহু সময়ও ব্যয় করে থাকতেন তিনি।

দার্শনিক হিসেবে ইবনে রুশ্‌দ ছিলেন দর্শনপিতা এরিস্টটলের গভীর অনুরাগী। এরিস্টটল রচনাবলীর ব্যাখ্যাতা হিসেবে তিনি এখনো বিখ্যাত। দর্শনকে তিনি স্বাধীন চিন্তাক্ষেত্র বিবেচনা করতেন। দার্শনিক ইমাম গাযালীর 'তুহফাতুল ফালাসিফা'-এর জবাবস্বরূপ তিনি 'তুহফাতুত্‌ তাহাফুত' লিখেন। তার রচিত 'কিতাবুল ফালাসিফা' এবং 'ফাস্‌লুল মাকালী ফি মুতাওয়াফিকাতিল হিকমাতিশ্‌ শারীয়াহ' গ্রন্থে স্বকীয় উপপাদ্য নিয়ে আলোকপাত করা হয়। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে প্লেটোর 'রিপাবলিকের' ব্যাখ্যা, ফারাবীর সমালোচনা, ইবনে সীনার সূত্রের আলোচনাও স্থান পায়। তার দর্শন চিন্তার মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলো– 'ধর্ম ও দর্শন উভয়ই চিরন্তন সত্য প্রচার করে এবং দর্শন ও কুরআনে বিবৃত সত্যের বিরোধিতা অচিন্তনীয়'। দুর্ভাগ্য, ধর্ম ও দর্শনের সমন্বয়কারী হিসেবে তার ভূমিকা থাকলেও তাকে ধর্ম বিরোধী চিন্তানায়ক বলা হয়। এজন্য তাকে অনেক নিন্দা ও প্রতিরোধের সম্মুখীনও হতে হয়। গোঁড়া আলেম সমাজ তাকে মুনাফিক, অবিশ্বাসী ও কুরআন বিরোধী বলে ব্যাপক প্রচার শুরু করে। ফলে ১১৯৪ ঈসায়ীতে তিনি দেশ থেকে বিতাড়িত হন। কর্ডোভার নিকটে তাকে বন্দী করে রাখা হয়।

কিছুদিনের মধ্যে খলীফা তাকে ঈর্ষার কারণ বুঝতে পারেন এবং পুনরায় রাজকার্যে অধিষ্ঠিত করেন। এ অবস্থায় কিছু দিন চলার পর তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। অবশেষে রাজধানী শহর মরক্কোয় ১১৯৮ ঈসায়ী সালের ১০ই

www.pathagar.com

ডিসেম্বর প্রায় ৭২ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। প্রখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত ও জীবনীকার E. Renan তার গ্রন্থ Averroes et Averroism -এ লিখেন, There is not hing to prevent your supposing that Ibn-Rushd was a sincere believer in Islam, especially when we consider how little irrational and super natural element in the essential dogmas of this religion is and gow closely this religion approaches the purest Deism. তিনি ইসলামী আদর্শের অনুসারী ছিলেন না-এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বস্তুত বহু মনীষী আপন যুক্তিপূর্ণ নতুন চিন্তাধারার কারণে তৎকালীন সময়ে অবাঞ্ছিত হয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে তাদের সম্পর্কে যেমন ভুল ভেঙ্গেছে তেমনি তারা উঠে এসেছেন মর্যাদার শীর্ষ চূড়ায়।

মুসলিম দার্শনিক ইবনে রুশ্‌দ সত্যিকার অর্থে এরিস্টটলের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার ছিলেন। তারই মাধ্যমে গ্রীক ও ইউরোপীয় দর্শনের সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়। ত্রয়োদশ শতকে তার রচনাবলী ও গ্রন্থাদি ল্যাটিন ও হিব্রুতে অনূদিত হয়। প্যারিস, ইতালী, অক্সফোর্ড ও পদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে তার অসংখ্য ভাষ্য পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। রজার বেকনের আমলে তাকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয়। কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ এবং পরে রেডিক্যাল হিউম্যানিস্ট আন্দোলনের পুরোধা এম. এন. রায় (১৮৮৭-১৯৫৪) লিখেন, 'আধুনিক সভ্যতার অগ্রদূতদের এরিস্টটলের প্রতিভার সঙ্গে পরিচিত করে যিনি ইউরোপীয় মানবতাকে অনুর্বর পাণ্ডিত্যাভিমান এবং ধর্মতত্ত্বের গোঁড়ামির পক্ষপাতদুষ্ট প্রভাব থেকে মুক্তি সংগ্রামে অপরিমিত প্রেরণা ও উৎসাহ দিয়েছিলেন সেই সুধী শ্রেষ্ঠ এ্যাবেরোজ (ইবনে রুশ্‌দ)-এর কীর্তিও অমর হয়ে রয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আন্দালুসীয় সুলতানের গৌরবোজ্জ্বল পৃষ্ঠপোষকতায় আরবের যে প্রধান যুক্তিবাদী বেড়ে উঠেছিলেন তার যুগান্তকারী ভূমিকা রজার বেকনের বহু পরিচিত এই উক্তিতে সরবে বিঘোষিত হচ্ছে, 'প্রকৃতির দ্বার উদঘাটন করেছেন ইবনে রুশ্‌দ'। ব্যতিক্রমী ও অনন্য সাধারণ এ তাপস দার্শনিকের গ্রন্থরাজির সঠিক ধারণা পাওয়া যায়নি। দর্শন ও চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কেই তিনি প্রধানত গ্রন্থ রচনা করেন। অন্যান্য শাস্ত্রেও বিক্ষিপ্ত কিছু বই পুস্তক লিখেছেন। ইবনে রুশদকে 'অথর অব দ্য থ্রি ইমপোস্টেজ এণ্ড টু রিয়েলিটিজ' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

www.pathagar.com

দার্শনিক ও যুক্তিবিদ মুহাম্মদ আল গাযালী

মুহাম্মদ আল গাযালী (১০৫৮-১১১১ ঈসায়ী সন) মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতার অন্যতম ব্যতিক্রমী প্রতিভু ছিলেন। তিনি সেই বিরল মনীষীদের একজন যিনি আজকের আধুনিক যুগে মুসলিম সমাজের কাছে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। প্রায় এক হাজার বছর আগে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং আশ্চর্যের বিষয় আজও তার বিভিন্ন রচনার সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে বিশ্বের বহু দেশে। বাংলা ভাষায় তো বটেই।

আল গাযালী ছিলেন নিজেই একটি নতুন যুগের স্রষ্টা। গতানুগতিকতার প্রবাহে তাকে ফেলা যায় না। তিনি নিয়মতান্ত্রিক নন তিনি বরং ব্যতিক্রমী। গ্রীক দর্শনের একচ্ছত্র প্রভাবে বড় মাপের মুসলিম দার্শনিক, যুক্তিবিদ ও চিন্তা নায়কেরা যখন গ্রীক বন্দনায় মত্ত, এমন এক সময়ে আল গাযালী যুক্তি ও দর্শনের সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিক এবং চিন্তাধারা তুলে ধরেন। যে দর্শনের বহু সমালোচনা হয়েছে, আজও হয় কিন্তু তাকে অবজ্ঞা ভরে কেউ দূরে ঠেলতে পারেনি। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক থেকে ক্রম উজ্জ্বলতা হারানো মুসলিম দর্শনের যে ক্ষীয়মাণধারা আজও জীবন্ত, সন্দেহ নেই তা আল গাযালীর স্রোতস্বিনীরই প্রবাহধারা।

আবু হামেদ মুহাম্মদ আল গাযালী ১০৫৮ ঈসায়ী সনে (৪৫০ হি.) পারস্যের 'তুস' নগরে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষকতা, দেশভ্রমণ এবং লেখালেখি– এই তিনটিই তার প্রধান কর্মভূমি বলা যায়। মাত্র ৩৪ বছর বয়সে (১০৯২ ঈসায়ী সন) তিনি তৎকালীন দুনিয়ার প্রধান বিদ্যাপীঠ বাগদাদের নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন এ পদের জন্য নিযুক্ত সর্বকনিষ্ঠ শিক্ষাবিদ। বহু দেশ ও জনপদ তিনি ভ্রমণ করেন। ভ্রমণকালেই তার লেখালেখি শুরু। স্বদেশে যখন ফিরেন তখন থেকে ইবাদত এবং আত্মসাধনায় শেষ পর্যন্ত নিমগ্ন থেকেছেন কিন্তু লেখালেখি বন্ধ হয়নি। তার দৃঢ়তা, তেজস্বিতা, গড্ডালিকার বিরুদ্ধে একা অবস্থান গ্রহণ, সমাজ-রাষ্ট্র

www.pathagar.com

এবং শিক্ষানীতি বিষয়ে সংস্কার একটি শতাব্দীর মহান মুজাদ্দিদ হিসেবে তাকে অভিষিক্ত করেছে। তিনি মাত্র ৫৫ বছর বয়সে ১১১১ ঈসায়ী সনে (৫০৫ হি.) ইন্তেকাল করেন।

আল গাযালীর সংস্কারকর্ম ও তার পটভূমি

আব্বাসীয় বংশ মুসলিম জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে এক লক্ষণীয় অবদান রেখেছে। কিন্তু শেষ দিককার অধিকাংশ শাসকই ছিলো অযোগ্য। তাদের অযোগ্যতা, আরামপ্রিয়তা ও মূর্খতার ফলে মুসলিম জগতে এক ঢিলেঢালা ভাব নেমে আসে। আলেমরা নিজেদের মাঝে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত। জ্ঞানীদের মাঝে গ্রীক দর্শনের প্রভাবে ইসলামী আকীদা গড়ে ওঠে। অকর্মণ্য আলেমরা দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার তেমন ধার ধরতেন না এবং এ ব্যাপারে তাদের জ্ঞান ছিলো শূন্য। শাসকদের তোষামোদ ও তল্পীবহন করতেই তাদের সময় অতিবাহিত হতো। ফলে গবেষণার কাজ স্তিমিত হয়ে পড়ে, ফেরকা ও দলবাজিতে তারা মেতে ওঠে। মুসলিম সমাজের সর্বত্রই ইসলামী মূল দর্শন হারিয়ে যেতে থাকে। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকরশ্মি থেকে বঞ্চিত হতে থাকে মুসলিম দুনিয়া। এমনই এক দুর্বিপাকগ্রস্ত সময়ে ইমাম আল গাযালীর আবির্ভাব। তখন সেলজুকি শাসকগণ ছিলো ক্ষমতায়। যুবক গাযালীর জ্ঞান গরিমা ও প্রভাবের কথা তারা ভালোই জানতো। তিনি তাদের মনোযোগ লাভ করেছিলেন বটে, নিজের স্বরূপে বেরিয়ে আসতে এতটুকু কার্পণ্য করেননি আল গাযালী সে সময়। স্বীয় আন্দোলন ও সংস্কার কার্যের সূচনার প্রস্তুতি পর্বের তিনি নিজেই বিবরণ দিয়েছেন : 'আমি দেখতে পেলাম, রোগ ব্যাধি গোটা জগৎটাকে ছেয়ে ফেলেছে এবং পারলৌকিক সৌভাগ্যের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। ওলামা, যারা ছিলেন সত্য পথের দলীলস্বরূপ, ক্রমেই তাদের অস্তিত্ব লোপ পাচ্ছে। আলিম নামধারী যারা এখনো আছেন, তারা নামকাওয়াস্তে আলিম, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও উদ্দেশ্য তাদের আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। তাদের মতে, 'ইল্‌ম স্রেফ তিনটি জিনিসের নাম : যথা- মুনাজারাহ বা পারস্পরিক বিতর্ক অনুষ্ঠান, যা গর্ব অহমিকা ও ফল লাভের মাধ্যমে ওয়াজ বা বক্তৃতা যার ভেতর জনসাধারণের

www.pathagar.com

মনোরঞ্জনের জন্য রঙিন ও ছন্দবদ্ধ ছড়া, কবিতা ও শ্লোক আবৃত্তিও করা হয় এবং ফতোয়া প্রদান, যা বিভিন্ন মামলা-মুকাদ্দমার ফায়সালার মাধ্যমে। বাকি রইলো আখিরাতের ইল্‌ম। এটা মূল লক্ষণীয় বিষয় হলেও অধিকাংশ আলেমই তা ভুলে গেছে। এতদৃষ্টি আমি আর ধৈর্যধারণ করতে পারলাম না।'

এই প্রেক্ষিতে আল গাযালী তার ঐতিহাসিক লেখনী ধারণ করেন। নীচে আমরা তার সংস্কারসমূহ অতি সংক্ষিপ্তাকারে মূল্যায়নের চেষ্টা করবো।

ক. গ্রীক দর্শনের কার্যকর সমালোচনা

গ্রীক দর্শনের প্রভাব ইসলামী দর্শনের উপর গভীর রেখাপাত করে রেখেছিল। এমনকি ইসলামী দর্শন হয়ে পড়েছিল কুয়াশাচ্ছন্ন। এর জন্য মুসলিম দার্শনিকগণ ছিলেন অনেকাংশে দায়ী। ইসলামের উপর দর্শনের এই বিরাট আঘাত মোকাবেলায় কেউ ছিলো না। কেউ কেউ কেবল ইল্‌মে কালামের সাহায্যে ইসলামের পক্ষে সাফাই গাইতো, এটা ছিলো নিতান্তই আত্মরক্ষামূলক এবং দূরবর্তী চিন্তার দিক দিয়ে এক অকার্যকর পদক্ষেপ। এই দুর্যোগ থেকে ইসলামকে রক্ষা করার জন্য গাযালী কলম হাতে নেন। তিনিই সেই সময় তৎকালীন দর্শনের মর্মমূলে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি সৃষ্টি করেন। দার্শনিক ভ্রান্ততার পক্ষে ক্ষুরধার যুক্তি উপস্থাপন করেন এবং পাশাপাশি ইসলামী দর্শনের সার্থকতার পেছনে তুলে ধরেন অমোঘ দলীল। সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী লিখেন, কয়েক শতাব্দী যে কাল্পনিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছিল তার উপর জ্ঞানগর্ভ আঘাত করার সাহস কারো হয়নি। আল গাযালী-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি দর্শনকে বিস্তারিত সমালোচনার নিরীখে অধ্যয়ন করেন। 'মাকাসেদুল ফালাসিফা', 'তাহাফাতুল ফালাসিফা' গ্রন্থদ্বয়ে তিনি সরল অথচ বিশ্লেষণমূলক ভাষায় যুক্তিবিদ্যা, অধিবিদ্যা (Motaphysics) এবং প্রকৃতি বিদ্যায় সার সংক্ষেপে পেশ করেন এবং পূর্ণ নিরপেক্ষতার সাথে দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গিরও সমালোচনা লিপিবদ্ধ করেন। দর্শন শাস্ত্রের উপর এই সাহসিকতাপূর্ণ সমালোচনা এবং নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত তার প্রতি অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন ইল্‌মে কালামের ইতিহাসে এমন এক নতুন যুগের সৃষ্টি করে যার সার্বিক কৃতিত্ব ইমাম আল গাযালীর প্রাপ্য।

www.pathagar.com

ইমাম আল গাযালী পাশ্চাত্য দার্শনিকদের কতিপয় মতামতকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, যুক্তি দিয়ে অনিবার্য বাস্তবতাকে (আল্লাহ) বিচার করা যায় না। তার মতে, দার্শনিকদের প্রধান ত্রুটি এই যে, তারা প্রাথমিক ধ্যান ধারণা সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করেন না। প্রত্যাদেশ অবিশ্বাসী ঈশ্বরবাদীদের মতবাদ তিনি স্বীকার করেননি। কারণ, বিশ্বকে সকল আধ্যাত্মিকতা হতে বঞ্চিত করা হয়। তিনি বলেন, এরিস্টটলীয় মতবাদকে ভিত্তি করে আল্লাহ বিশ্বাসীদের চিন্তাধারা গড়ে উঠেছে। তার মতে, গণিতের প্রয়োগ নিজস্ব সীমার মধ্যে হওয়া উচিত। অন্যান্য ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা হলে তা সঠিক ও নির্দিষ্ট জ্ঞান দিতে ব্যর্থ হবে।

'তাহাফাতুল ফালাসিফা' প্রচলিত দর্শনের ভোজবাজির উপর কার্যকর আঘাত হানে এবং দর্শনের মর্যাদাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই গ্রন্থ দর্শন জগতে অস্থিরতা, চাঞ্চল্য ও ক্রোধের জন্ম দেয়। প্রাচ্য পেরিয়ে পাশ্চাত্যেও গাযালীর ধারণা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং গ্রীক দর্শনের কর্তৃত্ব খতম আর আধুনিক গবেষণার যুগে দ্বারোদঘাটনের ব্যাপারে সহায়তা করে। পাশ্চাত্য বিদ্বৎসমাজ উল্লেখ করেছেন যে, দর্শনশাস্ত্রে গাযালীর আক্রমণ তাকে প্রায় মরণদশায় পৌঁছে দিয়েছিল, ইবনে রুশ্‌দের আবির্ভাব তাকে একশ বছরের জন্য পুনঃজীবন দান করে।

খ. ফেরকাবাজির প্রতি তার কার্যকর সমালোচনা

ইমাম আল গাযালী মুসলিম জনতার মধ্যে সংকীর্ণ দলাদলির যে কনসেপ্ট দাঁড়িয়ে যাচ্ছিলো তার তীব্র সমালোচনা করেন। এর মাধ্যমে যে জাতি হিসেবে কারো ভিত মজবুত হতে পারে না তা তিনি ভালোভাবেই অনুভব করেছিলেন। ছোট-খাট বিষয় নিয়ে জাতির ঝগড়া ও মতবিরোধ মূল মাহাত্ম্যকেই খর্ব করে। একথা তার সময়কালে যেমন সত্য ছিলো বর্তমান সময়েও তার গুরুত্ব এতটুকুও কমেনি। তাই গাযালীর উপলব্ধি ছিলো সে কালের হয়েও আজকেরই উপলব্ধি। তিনি সে কালের হয়েও অদ্ভুতভাবে এ কালেরই। আজকের মুসলিম জাতির যে ঝগড়া, খুঁটিনাটি গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে যে দলাদলি তা এ জাতিকে যে হীনবল করে রেখেছে তা তো নিত্য

www.pathagar.com

দৃশ্যমান। এর সুদূরপ্রসারী ক্ষতি লক্ষ্য করেই মুসলিম ঐক্যকে তিনি সমুন্নত করতে চেয়েছিলেন। চিন্তাবিদ, গবেষক সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) লিখেন : 'তিনি সমকালীন সকল মাযহাবী ফেরকা এবং তাদের মতবিরোধ পূর্ণরূপে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে ইসলাম ও কুফরের পৃথক পৃথক সীমারেখা নির্ধারণ করেন এবং কোন্ সীমারেখার মধ্যে মানুষের জন্যে মত প্রকাশ ও ব্যাখ্যা করার স্বাধীনতা আছে, কোন্ সীমারেখা অতিক্রম করার অর্থ ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া, ইসলামের আসল আকীদা বিশ্বাস কি কি এবং কোন কোন জিনিসকে অনর্থক ইসলামী আকীদার মধ্যে শামিল করা হয়েছে তা বিবৃত করেন। তার এ পর্যালোচনার ফলে পরস্পর বিবাদমান ও পরস্পরকে কাফের আখ্যাদানকারী ফেরকাসমূহের সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে অনেক বারুদ বের হয়ে যায় এবং মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়।'

গ. আলিমগণের কঠোর সমালোচনা

ইমাম আল গাযালী'র সমালোচনার অন্যতম লক্ষ্যবস্তু ছিলো অকর্মণ্য ও দিকভ্রান্ত আলিম পণ্ডিতগণ। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, তৎকালীন আলিমদের কাজ ছিলো তিনটি : বিতর্ক করা, বক্তৃতা বা ওয়াজ করা এবং ফতওয়া দেয়া। কিন্তু এগুলো যে প্রকৃত আলিমদের মূল দায়িত্ব নয় তার দায়িত্ব যে আরো গভীরে প্রোথিত তিনি সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেন নিজস্ব বক্তব্য। তিনি বলেন, দুনিয়ায় অশান্তি ও বিপর্যয়, ধর্মীয় ও চারিত্রিক অবনতির বড় জিম্মাদার আলিম হলেন জাতির জন্য 'লবণ' স্বরূপ। লবণ ছাড়া যেমন খাদ্যদ্রব্য যতই মূল্যবান হোক না কেন, বিস্বাদ লাগে, তেমনি আলিমগণের প্রকৃত দায়িত্ব পালন ছাড়া জাতির অবস্থা হয় তথৈবচ।

তার মতে আলিমগণের দায়িত্ব হলো, সৎ কাজের আদেশ দান করা আর অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা। কিন্তু তারা অনেকেই দুনিয়াদার হয়ে গেছেন এবং পদমর্যাদার পেছনে ছুটোছুটি করছেন। আলিমগণ সমাজের চিকিৎসক, তারা যদি জ্বরাগ্রস্ত হন তাহলে কে রোগ সারাবে? তার মতে সুলতান ও শাসকবর্গের খারাপ হবার কারণ, আলিমদের অদক্ষতা এবং স্বীয় দায়িত্ব পালনে তাদের অলসতা। তিনি যে প্রেক্ষিতে এ বক্তব্য রেখেছেন তার

www.pathagar.com

পটভূমিতে পরিচয় দিতে গিয়ে প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী লিখেছেন : 'ইমাম গাযালী (র)-এর যুগে একজন আলিমের জগত ফিকাহর ছোট-খাট ও খুঁটিনাটি ইখতিলাফী মাসলা-মাসায়েলের ভেতরেই সীমাবদ্ধ ছিলো। আলোচনা, সমালোচনা ও তর্ক বিতর্কের মজলিস বসতো ঘরে ঘরে, দেশের আনাচে কানাচে। বাদশাহদের দরবারগুলোর রওনকও ছিলো এই যে, অন্যান্য সব জ্ঞান বিজ্ঞান ও পেশা এবং দীনি খিদমতের বিভিন্ন বিভাগ উপেক্ষিত হতে চলছিলো। এর সীমা এতদূর বিস্তৃত হয়েছিলো যে, ইসলামের নফস তথা আত্মার সংস্কার, চারিত্রিক শালীনতা এবং পারলৌকিক সৌভাগ্য যেই ইল্‌ম ও প্রয়াসের নির্ভরশীল তা থেকে সবার মনোযোগ সরে গিয়েছিলো।' আল গাযালী এই প্রেক্ষিতে আলিমগণের উপর যে থেরাপী প্রয়োগ করেছিলেন তা তার সর্বশ্রেষ্ঠ মহৎ সৃষ্টি 'ইহয়ায়ে উলুমুদ্দিন'-এ বিবৃত রয়েছে। আমাদের সমাজও মুক্তি পেতে চাইলে তার অনুবর্তী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমাদের আলিম সমাজ আজ সেদিনকার সেই একই ট্রাপে বন্দী হয়ে পড়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

ঘ. প্রশাসনের ব্যক্তিবর্গ

সমকালীন দুনিয়ায় ধর্মের ক্ষতি ও বিকৃতি সাধনের ব্যাপারে দু'টি শ্রেণীই ছিলো প্রধানত দায়ী। এক. আলেম সমাজ; দুই. শাসকবর্গ। ইমাম আল গাযালী উক্ত দু'টি শ্রেণীকেই পূর্ণাঙ্গ সাহসিকতার সাথে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেন। ইতিহাসের খোঁজখবর রাখেন এমন সকলেই জানেন যে, সে যুগে শাসকবর্গের প্রভাব ছিলো অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও একচ্ছত্র। ইসলামের ইতিহাসের ক্ষণজন্মা মনীষীদের অনেকেই এসব শাসকদের তরবারির খোরাক হয়েছিলেন। তাদের নৃশংসতা আজো আমাদের ব্যথিত করে। আশ্চর্যের বিষয়, সে রকম এক যুগে বসেই গাযালী শাসকদের কড়া বাক্যবাণে বিদ্ধ করেন। মৃত্যুকে হাত দিয়ে ডেকে আনার নামান্তর ছিলো তার এই অসীম দুঃসাহসী কাজ। বাদশাহদের দান-উপহার পেয়েই যে যুগের আলিমরা ধন্য হয়ে যেতো, সেই সময়ে গাযালী বাদশাহদের ধন সম্পদকে হারাম ঘোষণা করেন।

www.pathagar.com

তিনি রাজন্যবর্গের সংস্পর্শে থেকে নিজে দূরে থাকতেন এবং অপরের জন্যও তাই কামনা করতেন। 'এই সুলতানদের নিজেদের চেহারা অন্যদের না দেখানো উচিত এবং অন্যদের চেহারা না দেখা উচিত। এদের জুলুমকে ঘৃণা করা, এদের অস্তিত্বকে পছন্দ না করা, এদের সাথে কোনো ধরনের সম্পর্ক না রাখা এবং এদের থেকে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের থেকেও দূরে অবস্থান করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য।' তিনি শাসকদের কাছ থেকে দূরে থাকতেন। কিন্তু যখন ঘটনাক্রমে দেখা হতো তখন গলে যেতেন না, তার তেজস্বিতা আরও বেশি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতো। তার প্রমাণ পাওয়া যায়, একবার শাসক মালিক সুলতান সঞ্জর-এর জনাকীর্ণ দরবারে তিনি তাকে বলেন : 'স্বর্ণ অলঙ্কারের ভারে তোমার ঘোড়ার পিঠ ভাঙ্গেনি তো কি হয়েছে, অনাহারে অর্ধাহারে মুসলমানদের পিঠ তো ভেঙ্গে গেছে।' আল গাযালীর যুগে প্রায় প্রত্যেক শাসককে তিনি তার দায়িত্ব কর্তব্য স্মরণ করিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। তার এ উপদেশগুলোর নাম 'নসীহাতুল মুলুক'।

৬. শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন

সে যুগের পুরনো এবং সেকেলে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে ইমাম আল গাযালী নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা পেশ করেন। সে সময়কার শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি ছিলো প্রধানত দু'টি– ১. দ্বীন ও দুনিয়ার শিক্ষার ব্যবস্থা ছিলো পৃথক, ২. শরীয়তের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন অনেক বিষয় শরীয়তের জ্ঞান হিসেবে পাঠ্যভুক্ত ছিলো।

এই ভ্রান্তিগুলো দূর করে তিনি একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। রক্ষণশীল এবং স্বার্থান্বেষী মহলের এতে অবশ্য গা জ্বালা শুরু করে। কিন্তু গাযালী-ই টিকে থাকেন ইতিহাসের পাতায়। তার প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থাই সকল মুসলিম দেশে স্বীকৃতি লাভ করে। সে সময় থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত আরবী পাঠ্য কারিকুলামে তার নির্ধারিত বইগুলো পঠিত হচ্ছে। ভাবতে অবাক লাগে, আধুনিককালে যখন আরবী শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করতে সবাইকে হিমশিম খেতে হচ্ছে, কোনো একটি ঐক্যমতে পৌছানো যায় না, অথচ বহু শতাব্দী আগে ইমাম আল গাযালী কী অসাধ্যই

www.pathagar.com

না সাধন করেছেন। মুসলিম সমাজে তার প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার এই অসামান্য প্রভাব ও অবদান, একজন কালজয়ী মুজতাহিদ হিসেবে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

চ. জনগণের নৈতিক উন্নতিতে ভূমিকা পালন

মুসলিম জাতির আচার, আচরণ বিশেষত নৈতিক চরিত্রের উন্নয়নে ইমাম আল গাযালীর অবদান অসামান্য। এক্ষেত্রে তার 'ইহ্য়ায়ে উলুমুদ্দিন' এবং কিমিয়ায়ে সা'দত গ্রন্থদ্বয়ের ভূমিকা অনন্য। এ রচনাবলীতে তিনি মুসলিম সমাজের প্রত্যেক স্তরের নৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করেন। প্রত্যেকটি দুষ্কৃতির মূল এবং তার মনস্তাত্ত্বিক ও তামদ্দুনিক কারণ অনুসন্ধানপূর্বক তিনি তার ধর্ম সম্মত সত্যিকার মানদণ্ড তুলে ধরেন। এ কারণে গ্রন্থগুলো ক্লাসিক মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। শুধু এ দু'টি গ্রন্থের জন্যই তিনি মুসলিম দুনিয়ায় চির স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারেন। মুসলিম ধর্ম বিশ্বাসের মূলনীতি, জীবনাচরণ পদ্ধতি, আত্মবিশুদ্ধতা অর্জনের উপায়, চারিত্রিক সাধুতা অর্জন এবং সূফীতত্ত্ব আলোচনার এক বিশাল সম্ভার এই রচনা। এর সর্ববৃহৎ সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো, এর অসামান্য প্রভাব। তা পাঠকের হৃদয়ে আশ্চর্যকর প্রভাব বিস্তার করে। এর প্রতিটি বাক্য ছবির মননে গেঁথে যায়, প্রতিটি বাক্য যাদুর ন্যায় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং প্রতিটি শব্দেই যেন এক একটি পৃথক কম্পন রয়েছে।'

ছ. শরীয়তের যুক্তিপূর্ণ উপস্থাপনা

ইসলামী আকীদা বিশ্বাস এবং মূলনীতিসমূহের এমন যুক্তিসম্পন্ন ব্যাখ্যা তিনি প্রদান করেন যাতে কয়েক যুগ পর্যন্ত ন্যায়শাস্ত্র ভিত্তিক কোনো আপত্তি উপস্থাপিত হতে না পারে। সেই সাথে তিনি শরীয়তের নির্দেশাবলী এবং ইবাদতের গূঢ় রহস্য এবং তার যৌক্তিকতা বর্ণনা করেন আর এমন একটি চিত্র পেশ করেন যার ফলে ইসলাম ধর্ম যুক্তি ও বুদ্ধির পরীক্ষার উত্তীর্ণতার মর্যাদা লাভ করে ও মানুষের সন্দেহকে বিদূরিত করে। প্রধানত এ কারণেই তাকে 'হুজ্জাতুল ইসলাম' তথা ইসলামের দলীল উপাধিতে বিভূষিত করা হয়। আল্লাহর যাত সিফাত, নবুওয়ত, মু'জিযা, শরীয়তের বিধানসমূহ,

www.pathagar.com

পুণ্য ও শাস্তি, আখিরাত, কিয়ামত সম্পর্কে তার মুজতাহিদসুলভ আলোচনা সমকালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'ন্যায় শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান না রাখার কারণে ইসলামের সমর্থকগণ দার্শনিক ও মুতাকাল্লিমদের মোকাবেলায় যেসব ভুল করছিলো তিনি সেগুলো সংশোধন করেন। পরবর্তীকালে ইউরোপের পাদ্রীরা যে ভুল করেছিলো ইসলামের এই সমর্থকরা ঠিক সেই পর্যায়ে ভুল করে চলছিলো অর্থাৎ ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসের যুক্তি প্রমাণকে কতক সুস্পষ্ট অযৌক্তিক বিষয়াবলীর উপর নির্ভরশীল মনে করে অথবা সেগুলোকে মূলনীতি হিসেবে গণ্য করা, অতঃপর ঐ মূলনীতিগুলোকেও ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে শামিল করে যারা সেগুলো অস্বীকার করে তাদেরকে কাফের গণ্য করা আর যে সমস্ত দলীল প্রমাণ, অভিজ্ঞতা বা পর্যবেক্ষণের সাহায্যে মনগড়া ঐ নীতিগুলোর গলদ প্রমাণিত হয়, সেগুলোকে ধর্মের জন্যে বিপদস্বরূপ মনে করা। এ জিনিসটিই ইউরোপকে নাস্তিকতাবাদের দিকে ঠেলে দিয়েছে। মুসলিম দেশসমূহে এ জিনিসটিই বিপুল বিক্রমে কাজ করে যাচ্ছিলো এবং জনগণের মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু ইমাম গাযালী যথাসময়ে এর সংশোধন করেন। তিনি মুসলমানদেরকে জানান যে, অযৌক্তিক বিষয়সমূহের উপর তোমাদের ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসের প্রমাণ নির্ভরশীল নয় বরং এর পেছনে উপযুক্ত প্রমাণ আছে। কাজেই ঐগুলোর উপর জোর দেয়া অর্থহীন'।

উক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও আরো অবদান ও ইজতিহাদী কর্মকাণ্ড রয়েছে। তিনি নসীহত, উৎসাহ এবং সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন মানুষের জন্য এবং পৃথিবীর অনিত্যতা, আখিরাতের মাহাত্ম্য, ঈমান ও সৎকাজের প্রয়োজনীয়তা, সংস্কার-সংশোধন, আত্মার শুচি শুভ্রতার গুরুত্ব ও অন্তরের ব্যাধি ও প্রবৃত্তির ক্ষতিকর বিষয়াবলীর উপর পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। তার বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব ও বোধপূর্ণ বক্তব্য তখন যেমন ব্যক্তি ও সমাজকে জাগিয়ে তুলেছিল, এখনও তা নাড়া দেয় পাঠকদের মনকে। সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী আল গাযালীর এই গ্রহণযোগ্যতার দু'টি বৈশিষ্ট্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন– একটি ইখলাস তথা অন্তরের বিশুদ্ধতা, অন্যটি উচ্চাকাঙ্ক্ষা। তিনি উল্লেখ করেন... তার ইখলাসের

www.pathagar.com

স্বীকৃতি শত্রু মিত্র সবাই দিয়েছে এবং তার রচনার প্রতিটি শব্দ থেকেই তা উদ্ভাসিত হয়েছে। ... এই ইখলাসই তাকে জ্ঞান জগতের শাহী মসনদ পরিত্যাগ, বছরের পর বছর মরু ময়দান ও উন্মুক্ত বিয়াবান অতিক্রম, শাহী দরবারের উপর্যুপরি আহ্বান ও ঐকান্তিক অনুরোধ এবং সে যুগের সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা উপেক্ষা করার শক্তি যোগায় ও পরমুখাপেক্ষীহীন করে রাখে... উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিলো তার জীবনের বিশেষ প্রতীক। তিনি ইল্‌ম ও আমলের গণ্ডীর মধ্যে স্বীয় যুগের মান এবং আপন সমসাময়িকদের কোন মার্গেই সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত থাকেননি। স্মর্তব্য, ইমাম আল গাযালী কেবল ইল্‌ম, আমল, লেখালেখি ও ইজতিহাদ কর্মেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, একটি নবতর ইসলামী সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তার জীবনীকার আল্লামা শিবলী এ বিষয়ে স্বীয় গ্রন্থে আলোকপাত করেছেন।

ইমাম আল গাযালীর বৃহৎ কর্মকাণ্ডের ধর্মীয় মূল্য সম্পর্কে তার সমালোচকগণও প্রশংসামুখর। যে কারণে তার সমালোচনা হয়– তা হলো হাদীস ও ইতিহাসের বর্ণনার দৌর্বল্য, তাসাউফ আলোচনায় খুঁটিনাটি কিছু অনুকরণ উপযোগী নয় এমন ঘটনার উল্লেখ এবং কোন কোন সমালোচকের মতে, বুদ্ধিবাদিতার ওপর যুক্তিবাদিতা ও ন্যায় শাস্ত্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

ইমাম আল গাযালীর প্রতিভা ধর্মীয় গণ্ডীর বাইরেও অসামান্য শান্তির আলোক বিতরণ করে। একজন ব্যতিক্রমী চিন্তানায়ক হিসেবে তিনি ইউরোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মধ্যযুগে খ্রিস্টান জগতে Raymund Martin (B-1285), স্পেনীশ চিন্তাবিদ Miguel Asian Palacious, সেন্ট টমাস একুইনাস (১২২৫-১২৭৪), ফরাসী দার্শনিক বিজ্ঞানিক ব্লেইজ পাসকেল (১৬২৩-১৬৬২ খৃ.), Renan, Mcdonald প্রমুখ তাদের রচনায় ইমাম আল গাযালীকে অমর করে রেখেছেন।

তিনি দর্শনের নতুন পথের প্রবক্তা ছিলেন, ছিলেন একজন উঁচুদরের সূফী। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে তার দর্শন ও শিক্ষা নিয়ে থিসিস হয়েছে এবং হচ্ছে, আরো যে হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আধুনিক সংশয়বাদের

www.pathagar.com

জন্মদাতা বলা হয় হিউমকে। কিন্তু ফরাসী ভাব-বিশারদ মনে করতেন, হিউম তার সাতশত বছর পূর্বে জন্মগ্রহণকারী ইমাম আল গাযালীর কথার উপরে নতুন আবিষ্কার করেন, তা চিন্তার জগতে অভূতপূর্ব দিক নির্দেশ ছিলো। তাই ভারতীয় মনীষী এম. এন. রায় হিন্দু তান্ত্রিকতার মুক্তি খুঁজেছেন ইমাম আল গাযালীর পথে। লিখেছেন : 'প্রায় হাজার বছর পূর্বে এই মুসলিম মনীষী অভ্রান্ত জ্ঞান লাভের যে পদ্ধতির নির্দেশ দিয়েছিলেন তা তখনও যেমন ছিলো, এখনও তেমনি মূল্যবান হয়ে রয়েছে। যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এই ধরনের জ্ঞানলাভ সম্ভব করে তুলতে পারে, ভারতবাসীদের মধ্যে এখনও তার প্রসার অপেক্ষাকৃত কম। কারণ ভারতবাসীরা বিংশ শতাব্দীর এ দিনেও ঐন্দ্রজালিক অসাধারণতা আর আধ্যাত্মিক জারিজুরির প্রভাবে নিজেদের ভাসিয়ে দিতে চায় আর এগুলোই বিজ্ঞানের সত্যকে স্বীকার করার বিরুদ্ধে সাংঘাতিক প্রমাণ বলে মনে করে'।

ইমাম আল গাযালী ছিলেন একজন ক্ষণজন্মা কালজয়ী মনীষী। ইসলামের লালন ও পুনঃজীবনদানের ধারায় তার আসন সংশয়াতীত, তার সংস্কারকর্ম ও সৃষ্টি আজো মুজতাহিদগণের প্রেরণার উৎস।

www.pathagar.com

রসায়নবিদ জাবির ইবনে হাইয়ান

জাবির ইবনে হাইয়ানকে বলা চলে পৃথিবীর সর্বপ্রথম রসায়ন বিজ্ঞানী। তার পূর্বে যে রসায়ন চর্চা হয়নি তা নয়, কিন্তু চর্চার মধ্যে ঠিক বর্তমানে রসায়ন বলতে সাধারণত যে ধীরস্থির নিয়মানুগতিক সুবোধ্য ধারার কথা মনে হয় তেমন কোন ধারার অস্তিত্বই ছিলো না। রসায়ন ছিলো তখন যাদু বিদ্যার অন্যতম প্রতীক। সাধারণ মানুষ একে দেখতো ভয়ের চোখে, বিদ্বানসমাজ একে বিজ্ঞান হিসেবে আমলেই নিতেন না। মুসলিম বিদ্বানসমাজও এর বাইরে ছিলো না। রসায়নের এমনি এক সময়েই জাবিরের আবির্ভাব। তার কঠোর অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি হতে রসায়ন দর্শন, গণিত ও চিকিৎসাশাস্ত্রের সমপর্যায়ের পরিপূর্ণ বিজ্ঞান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

আবু আবদুল্লাহ জাবির ইবনে হাইয়ান আল কুসী আরব বংশোদ্ভূত, কূফা ভিন্ন মতে তূসে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্ম তারিখ নিয়ে বেশ মতভেদ রয়েছে। ৭২২ সালে মতান্তরে ৭৩০ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার জীবনী সম্পর্কেও তেমন কিছু জানা যায় না। তবে তার বিজ্ঞান অনুশীলন শুরু হয় আব্বাসীয় খলীফা হারুন অর রশিদের (৭৮৬-৮৯০ ঈসায়ী সন) রাজত্বকালে। কূফায় তার বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলছিলো। ফিহরিস্তের মতে, তার রসায়নাগারও এখানে স্থাপিত হয়। তার মৃত্যুর একশত বছর পর কূফার প্রান্তরে অবস্থিত দামাশকাস গেটের নিকট নতুন রাস্তা তৈরি করতে কতগুলো ঘর ভেঙ্গে ফেলার সময় ২০০ পাউণ্ড ওজনের একটি সোনার থাল ও একটি খল পাওয়া যায়। অবশ্য ঐতিহাসিক হিট্টি উল্লেখ করেন, তখন তার মৃত্যুর দুইশত বছর অতিবাহিত হয়েছিলো।

৭৭৬ মতান্তরে ৮১৩ সালে জাবির মৃত্যুবরণ করেন। জাবির ইবনে হাইয়ানের জীবনীকারদের অন্যতম চতুর্দশ শতাব্দীর প্রখ্যাত রাসায়নিক আল জিলকাদীর (মৃ. ১৩৬০ ঈসায়ী সন) রচিত 'কিতাবুল বুরহান ফি আসরারে

www.pathagar.com

ইলমুল মিজানে' উল্লেখ আছে, আজদ বংশীয় জাবির কূফায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রসায়নশাস্ত্র শিক্ষার পর ইমাম জাফর সাদিকের নিকট গমন করেন, পরে বারমাকীদের সাথে যোগ দেন। এ সময়ে তিনি অনেক পরীক্ষা কার্য চালান। বারমাকী মন্ত্রী জাফরের সহায়তায় তিনি খলীফা হারুন অর রশিদের অনুগ্রহভাজন হন। তিনি খলীফার জন্য The book of blossom বা 'কিতাবুন নুহাস' The book of copper প্রণয়ন করেন। তারই উদ্যোগে দ্বিতীয় বারের জন্য গ্রীক গ্রন্থাবলী কনস্টান্টিনোপল থেকে আনীত হয়। তিনি নব্বই বছরেরও অধিককাল জীবিত ছিলেন।

জাবিরের পিতা হাইয়ান ছিলেন খ্যাতনামা চিকিৎসক। সেই সূত্রে চিকিৎসা বিষয়েও তার আগ্রহ ছিলো। বর্ণনা আছে, পিতার মতো তিনিও চিকিৎসা ব্যবসা দিয়ে জীবন শুরু করেন। জাবির ছিলেন নিঃসন্দেহে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। ইউক্লিড, আর মাজেস্টের ভাষ্য, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও কবিতা বিষয়ে তিনি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এছাড়া সূফীবাদ Appollonius-এর আধ্যাত্মিকতাবাদ সম্বন্ধেও তিনি আলোচনা করেন। জাবির গ্রীক ভাষা জানতেন এবং গ্রীক ভাষাতেই সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের লেখার সাথে পরিচিত হন।

ইবনে নাদিম জাবির ইবনে হাইয়ানের লেখা গ্রন্থের সংখ্যা উল্লেখ করেছেন দুই হাজারের বেশি– অতিশয়োক্তি মনে হলেও এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কারণ তার প্রাপ্ত গ্রন্থগুলোর অনেকটার গড় পৃষ্ঠা ৮/১০ এর মতো, এমনকি অনেকগুলোর পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র ২টি।

আল জাবির রচিত গ্রন্থসমূহের বিষয় ও সংখ্যা মোটামুটি নিম্নরূপ :

রসায়ন বিষয়ে–	২৬৭টি
কিতাবুত্ তাকদীর ধরনের গ্রন্থ–	৩০০টি
দর্শন বিষয়ে–	৩০০টি
যুদ্ধাস্ত্র বিষয়ে–	৩০০টি
চিকিৎসা সম্বন্ধীয়–	৫০০টি

www.pathagar.com

দার্শনিক যুক্তিখণ্ডন বিষয়ক– ৫০০টি

জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যামিতি ও অন্যান্য– ৫টি

রসায়ন বিষয়ক রচনা জাবির ইবনে হাইয়ানকে চির অমর করে রেখেছে। এ বিষয়ে কয়েকটি শ্রেষ্ঠতম রচনা হলো 'কিতাবুর রহমত', 'কিতাবুত তাজমী' এবং 'জিবাক উশ্-শরকী'। বিশ্বের বিভিন্ন মিউজিয়ামে রক্ষিত তার কিছু রসায়ন গ্রন্থের নাম হলো :

১. উস তুকিসিল উসিল আউয়াল ইলাল বারামেক (The First Book of Foundation to Barmaccides) ১৮৯৯ সালে ভারতে লিথো ছাপা হয়।
২. তাফসিরুল উসতুকিস (An Explanation of Istuqus)
৩. সুন্দুকুল হিকমা (The Basket of Wisdom) কায়রোর রাজকীয় লাইব্রেরিতে পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে।
৪. কিতাব ইখরাজ মা ফিল কাওয়াতে ইলা আল ফিল (The book of extraction from Potentiality to actuality), ঐ
৫. কিতাবুল হুদুদ (The book of definitions), ঐ
৬. কাশফুল আসরার ওয়া হাক্কুল আসতার (The unveiling of Secrits and the Reasling of veils), ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বর্তমান।
৭. রিসালা ফিল কিমিয়া (Letter on Chemistry), কায়রো, ঐ
৮. খাওয়াসুল ইকসিরুজ জাহাব (The progerties of Elinir of gold), প্যারিস Bisi, Nat, Argbe-এ পাণ্ডুলিপি বর্তমান।
৯. কিতাবুল মুকাবিলা ওয়াল মুমসিলা (The book of Comparison and Similituoles) বার্লিন মিউজিয়ামে পাণ্ডুলিপি বর্তমান।
১০. কিতাবুর রহমত (The book of Mercy), লিডেনে রক্ষিত আছে।
১১. কিতাবুর রহমাস সগীর (The little book of Mercy), প্যারিস।
১২. কিতাবুত্ তাজমী (The book of Concentration), লিডেন।
১৩. কিতাবুত্ তাজরীদ (The book of Abstraction), ভারত।
১৪. কিতাবুস সহল (The book of Ease), ব্রিটিশ মিউজিয়াম।
১৫. কিতাবুস্ সাফী (The book of Purity), ঐ

www.pathagar.com

১৬. কিতাবুল ইহরাক (The book of Combustion),

১৭. কিতাবুত্ তাকলীস (The book of Calcination),

১৮. কিতাবুল আবদাল (The book of Exchanges),

১৯. কিতাবুল উসূল (The book of Roots i.e Fundamental Principles) ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত।

২০. কিতাবুর রাহা (The book of Repose),

২১. কিতাবু সিরর আল মাকতুম (The book of the Hedden Secret),

২২. কিতাবুজ জাহাব (The book of Gold),

২৩. কিতাবুল ফুদ্দা (The book of Silver),

২৪. কিতাবুল নুহাস (The book of Copper),

২৫. কিতাবুল হাদীদ (The book of Iron),

২৬. কিতাবুল উসরুর (The book of Lead),

২৭. কিতাবুল কালী (The book of Tin),

২৮. কিতাবুল খারসিনি (The book of Tutenag),

২৯. কিতাবুল ইজাজ (The book of Abbreviation),

৩০. কিতাবুন নার ওয়াল হাজার (The book of Fire and Stone),

৩১. কিতাবুত্ তানকীয়া (The book of Cleanning),

৩২. কিতাবুত্ তানজীল (The book of Reduction per descensum),

৩৩. কিতাবুস সুমুম (The book of Poisons),

৩৪. তাদবীরুল হুকামাল কুদামা (The book of Operation of the Ancient Sages),

৩৫. কিতাবুর রিয়াদ (Book of Garden),

এছাড়া আরো অনেক গ্রন্থের নাম পাওয়া যাচ্ছে। ঐতিহাসিক তথ্য বিভিন্নতায় এ তালিকা আরো প্রবৃদ্ধ হয়েছে। জাবিরের রাসায়নিক মতবাদ ও কার্যাবলী :

www.pathagar.com

রসায়ন শাস্ত্রের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে জাবির 'কিতাব ইলমেস সানতিল ইয়াহিয়া ওয়াল হিকমাতিল ফালাসিফা' (The book of knowledge of the Divine art and Philosophical wisdom) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ রসায়ন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটি শাখা। এতে দ্রবণীয় বস্তু বা ধাতুসমূহের গঠন প্রণালী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হয় এবং খনিতে কিভাবে আগুনের সাহায্যে ধাতু উৎপন্ন হয় সে সম্পর্কেও অনুসন্ধান চালানো হয়। কেননা কৃত্রিম উপায়ে এ সমস্ত তৈরি করতে মানুষকে প্রাকৃতিক নিয়মেই অনুসরণ করতে হবে। যারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ তারা জানেন যে রসায়ন বিজ্ঞান প্রকৃতিরই অনুকরণ এবং সেই অনুসারেই গড়ে উঠে।

জাবিরের মতে, রসায়ন সাধনায় ১০টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখলে সাফল্যের আশা করা যায়। তা হলো ঃ

১. সাধকের জানা উচিত কেন তিনি এই প্রক্রিয়া অনুসারে কাজ করছেন।
২. এ বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রায়োগিক ভাষা জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়।
৩. যা অসম্ভব ও নিরর্থক তা নিয়ে কোন চেষ্টা না করা।
৪. কাজের সময় ও ঋতু সাবধানের সাথে ঠিক করা।
৫. ল্যাবরেটরী নির্জন স্থানে হওয়া উচিত।
৬. রসায়নবিদের বন্ধু-বান্ধব যেন বিশ্বস্ত হয়।
৭. পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবার মতো নির্মল অবসর থাকা দরকার।
৮. ধীর স্থির ও বাক সংযত হতে হবে।
৯. তাকে অধ্যবসায়ী হতে হবে।
১০. তিনি কার্যকলাপের শুরুতেই উদ্ভূত বাহ্যিক পরিবর্তন ও আকার প্রকার দেখেই কাজ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন না।

রাসায়নিক বস্তুসমূহকে জাবির জীবিত ও মৃত এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। তার মতে, প্রত্যেক রাসায়নিক বস্তুই অন্য জীব-জন্তুর মতো দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে গঠিত। এর একটি হলো দৈহিক অংশ অন্যটি আধ্যাত্মিক। রসায়নবিদের কাজ হলো দেহ ও আত্মার সঠিকভাবে বিভাগ করে, যে দেহ যেমন আত্মার খাপ খায় তাকে তাই দিয়ে সাজিয়ে দেয়া। তিনি বিভিন্ন গ্রন্থে গন্ধক ও পারদ থিওরির কথা উল্লেখ করেছেন। কিতাবুল উজাহতে তিনি

www.pathagar.com

বলেছেন, ধাতুসমূহ আসলে পারদ ও গন্ধকের সংমিশ্রণ। এ উভয়ের পার্থক্য কেবল অভ্যন্তরীণ গুণের। এই অভ্যন্তরীণ গুণের পার্থক্যও প্রধানত গন্ধকের জন্যেই। আবার গন্ধকের এ পার্থক্যও হয় স্থানের এবং সূর্যের তাপের জন্য। অনেক জাতের গন্ধকের মধ্যে সোনালী রংয়ের গন্ধকই শ্রেষ্ঠ। এটি পারদের সঙ্গে যুক্ত হলে সোনা তৈরি হয়। সোনার সঙ্গে অন্যান্য ধাতুর পার্থক্য হলো যে সোনা আগুনে পোড়ানো যায় না, এটি ঠিকই থাকে।

বিভিন্ন গ্রন্থে গন্ধক ও পারদ সম্পর্কে জাবির যে মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিজ্ঞান জগতে প্রতিষ্ঠিত ছিলো। তার এই থিওরির শেষ পরিণতি Phlogiston Theory যদিও এ দু'য়ের মধ্যে ব্যবধান খুব সামান্য কিন্তু এ ব্যবধান অতিক্রম করতেই বিজ্ঞান জগতের লেগে যায় ৮০০ বছর।

রসায়নে ব্যবহৃত জিনিসগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করে তিনি 'উসতুকা সিল আস (Book of Foundation to Barmaccides) গ্রন্থে লিখেছেন ঃ যারা পাথর ব্যবহার করার পক্ষপাতী তাদের মতে রসায়নের জ্ঞান পাথরের মধ্যে নিহিত, জান্তব বা উদ্ভিদ জাতীয় জিনিসের সম্বন্ধে জ্ঞান বা ব্যবহারের মধ্যে নয়। তারা বলেন, রসায়নবিদরা পাথরের বর্ণনা দেয়ার সময় ধাতব পদার্থের দিকেই লক্ষ্য করেছেন অন্য কিছু তাদের লক্ষ্য নয়। এ ধাতব পদার্থগুলো – গন্ধক, জারনিখ, পারদ এবং আজসাদ (বস্তুসমূহ)। এগুলোকে রূহ, জিসম, নফস এবং জাসদ-এ চারভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যে সমস্ত জিনিস আগুনের তাপে উবে যায় সেগুলো হলো আরওয়াহ। এ দুই রকমের এবং সংখ্যায় ৬টি গন্ধক, জারনিখ, নিশাদল, কর্পুর, তেল এবং পারদ। এগুলোর মধ্যে ৩টি আগুনে পোড়ে এবং যে সমস্ত জিনিস তাদের সংস্পর্শে আসে তাদেরও পোড়ায়। এ তিনটি জিনিস হলো গন্ধক, জারিখ বা আর্সেনিক সালফাইড এবং তেল। অন্য তিনটি আগুনের তাপে উবে যায়। এগুলো নিজেরাও আগুনে পোড়ে না অন্যকেও পোড়ায় না। এগুলো হলো ঃ নিশাদল তথা সাল এমোনিয়াক, পারদ এবং কর্পুর।

জাবিরের রাসায়নিক কার্যাবলী আলোচনা করতে গিয়ে তার জীবনীকার এম. আকবর আলী লিখেন ঃ রসায়ন শাস্ত্রকে ব্যবহারিক বিজ্ঞান হিসেবে কাজে

www.pathagar.com

লাগিয়ে নিতে যে সমস্ত প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হয়, জাবির তার প্রায় সবগুলোর সঙ্গেই বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। পূর্বেকার প্রচলিত প্রক্রিয়াগুলোকে সংস্কার ও সুশৃঙ্খলিত করে তোলেন। পাতন (Distillation), ঊর্ধ্বপাতন (Sublimation), পরিস্রাবণ (Filtration), দ্রবণ (Solution), কেলাসন (Crystallisation), ভস্মীকরণ (Calcination), গলন (Melting), বাষ্পীকরণ (Evaporation) প্রভৃতি রসায়নে প্রাথমিক প্রক্রিয়াগুলোকে তিনি বিজ্ঞান সম্মতভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রত্যেকটি রাসায়নিক কাজে তিনি যেভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন সেভাবেই তিনি সেগুলোকে ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তার গ্রন্থ থেকেই সে কথা ভালোভাবেই বুঝা যায়।

রসায়নে ব্যবহারিক প্রক্রিয়ায় তিনি যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন বিজ্ঞানের রীতির দিক দিয়ে তাতে তেমন ত্রুটি ছিলো না। সীসা থেকে তৈরি করা, সীসা-শ্বেত (White lead) প্রস্তুতকরণ, পারদকে লাল কঠিন পদার্থে পরিণত করা প্রভৃতি প্রক্রিয়া থেকে এটি চিহ্নিত করা যায়।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জাবিরের অগ্রসর মনের পরিচয় পাওয়া যায়। Liber Secretorum Calids Filil ladichi নামক ল্যাটিন অনুবাদে তার ছয়টি রাসায়নিক প্রক্রিয়া উল্লেখ করা হয়েছে– বস্তুর রূহ ও নফস থেকে ক্লেদ বের করে তাড়িয়ে দেয়া।

১. এই শুদ্ধিকৃত দেহকে তরল করা।

২. দেহকে তাশমি প্রথায় শুদ্ধ করা।

৩. দেহকে সাদা করা বা তাড়াতাড়ি গলানো।

৪. তাহলিল করা।

৫. আকদ করা বা দেহকে রূহের সাথে মিলিয়ে দেয়া।

জাবিরের অনেক গ্রন্থ ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়। এই অনুবাদের কারণে তিনি ইউরোপে Geber নামে পরিচিত।

www.pathagar.com

চিকিৎসাবিদ আবু বকর মুহাম্মদ বিন জাকারিয়া আর রাজী

পাশ্চাত্যে রাজেস (Rhazes) নামে পরিচিত আবু বকর মুহাম্মদ বিন জাকারিয়া আর রাজী (৮৪১-৯২৬ ঈসায়ী সন) নবম শতাব্দীর চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি বিস্ময়। শুধু তাই নয় তিনি চিরকালের এক মহান বিজ্ঞানী। তিনি মোট ৩৫ বছর চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন । Browne এর মতে, 'Al-Razi was the most original and respectable physician of Islam. He is the author of works that are informed by personal knowledge and experience and useful books. রাজী চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে ১১৭টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মৌলিক অবদান সম্পর্কে Campble বলেন– He was a great clinical and ranks with Hippocrates as one of the original portrayers of disease. He was the first to introduce chemical preparations into the practice of medicine. His 'Liber de Variolis et Morbills' is the oldest and most original work on small Pox and Measles and constitute a distinet original contribution to medicine by the Arabians. He was the first to distinguish themone from another and to write a lucid account that was almost modern in its presentation of clinical detail'.

আর রাজী হাম, শিশু চিকিৎসা, নিউরোসাইকিয়াট্রিক ইত্যাদি চিকিৎসা সম্পর্কে নতুন মতবাদ প্রবর্তন করেন। Prof Mettler-এর মতে, তিনি প্রথম শিশু রোগ সম্পর্কে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সে হিসেবে তাকে 'Peadiatrics' এর জনক বলা যেতে পারে। শিশু রোগকে তিনি ২৩ ভাগে বিভক্ত করেছেন। রাজী সর্বপ্রথম স্নায়ু দুর্বল্য মানসিক রোগ হিসেবে Neuropsy chiatric সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। Intreventicalar hydrocephalus সম্পর্কে তিনিই প্রথম আলোচনা করেন। 'কিতাবুল মনসুরী' গ্রন্থে তিনি

www.pathagar.com

'সন্ন্যাস রোগ' ও 'পক্ষাঘাত' সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন, তার মতে রক্ত ও শ্লেষ্মার জন্যই এ রোগ হয়। তিনি প্রথম সন্ন্যাস রোগের চিকিৎসায় ভেজা কাঠি লাগান এবং টাইফয়েডের বেলায় ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের Sherringtons Conditional Reflex Theory মতবাদের পূর্বাভাস দেখতে পাওয়া যায় তার Of Habit Which become Natural গ্রন্থে।

গ্রীকরা পারদকে অত্যন্ত বিষাক্ত মনে করতেন কিন্তু রাজীই পারদের মলম প্রবর্তন করেন। বানরের উপর পরীক্ষার পর তিনি এ উদ্ভাবন করেন। আর রাজীর চিকিৎসা গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি যেমন 'কিতাবুল হাবী', 'কিতাবুল মনসুরী' 'জুদরী ওয়াল হাসবাত' 'তাফসীমুল ইলাল'- প্রভৃতি ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার গ্রন্থসমূহের যে সকল ল্যাটিন অনুবাদ আছে তা হলো :

১. The Continens- ইহূদী ইবনে ফারাজ অনূদিত, ১২৮০ ঈসায়ী সন।

২. Liber ad-al Monsorem- অনুবাদ ক্রিমেনার জিরাল্ড।

৩. Liber Divisionum- ক্রিমেনার জিরাল্ড অনূদিত।

৪। Antidotarim- ইহূদী লেখক ইব্রাহীম কালচারী অনূদিত।

৫। De Aegritudinibus proeconum জনৈক হিব্রু পণ্ডিত কর্তৃক অনূদিত।

৬। De Proprietatibus Membrorum et Utititabus et Nocumentis Animalium Aggregatus exdictis antequoram- অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি কর্তৃক হিব্রু থেকে ল্যাটিনে অনূদিত এবং ১৪৯৭ সালে ভেনিস থেকে প্রকাশিত।

৭। Liber de Variolis et morbillis- এর অনেকগুলো ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে ভেনিস ১৪৯৮ ঈসায়ী সন ১৫৫৫ ঈসায়ী সন বাসলে থেকে ১৫২৯ ঈসায়ী সন ১৫৪৪ ঈসায়ী সন আরজেনটর থেকে ১৫৪৯ ঈসায়ী সন লণ্ডন থেকে ১৭৪৯ ঈসায়ী সন এবং গর্টনজেন থেকে ১৭৮১ খৃ. প্রকাশিত সংস্করণ অন্যতম। মধ্যযুগে তার আরো অনেক গ্রন্থ অনূদিত হয়।

www.pathagar.com

আর রাজীর 'কিতাবুল হাবী' সর্ববৃহৎ গ্রন্থ। খল্লিকানের মতে, এটি ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত। পৃথিবীর পুরাকালের চিকিৎসা ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। Prof. W.A.Greenhill বলেন, Not withstanding defects, the Contnens of Rhages is Universally admitted to be one of the most valuable and interesting medical works of antiquity though it might at first sight appear to be one of the most repulsive. চক্ষুরোগ বিশেষ করে Opthalmic surgery-তে তার বিশেষ অবদান আছে বলে সাধারণ মত প্রকাশ করেছেন। কাওসার সম্পর্কে তিনি বলেছেন, যতদূর সম্ভব কেটে ফেলে দিতে হবে, কোন দুর্বলতা দেখানো চলবে না। আর রাজীর 'বাররুত সায়াত' গ্রন্থটি ১৭০০ সালে হুসেন জাবির আনসারী ফার্সিতে অনুবাদ করেন দিল্লীর সুলতান আজিম শাহের জন্য। Dr. P. Guigues এর ফরাসী অনুবাদ করেন 'La Guerison en une Heure per Rhazes' নাম দিয়ে। ১৯৩২ সালে এগুলোর অনেক ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। পথ্য ও খাদ্য সম্পর্কে রাজীর কয়েকটি রচনা হলো 'কায়ফিয়াতিল আগাজী', 'মাকালাতুন ফিল আগাজিয়াতিল মুখতাসির', 'কিতাবু তিব্বুল মুলূকী', 'তারতিব আকলিল ফাওয়াকিহ', 'রিসাল ফিল মায়ি ওয়াল মুবাররাদ' ইত্যাদি।

www.pathagar.com

চিকিৎসা বিজ্ঞানী আবুল কাসেম খালাফ আজ্জাহরাবী

ইউরোপে স্পেনীয় খ্রিস্টানরা শব ব্যবচ্ছেদের ব্যাপারে খুবই রক্ষণশীল ছিলেন। তাদের কাছে এটা অধার্মিকতা ছিলো। পোপ ৮ম বেনেডিক্ট ১২৯৯ ঈসায়ী সন এই ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করেন এবং এনডিয়াস ভেসাসিয়াস (১৫১৪-১৫৬৪ ঈসায়ী সন) একটি শব-ব্যবচ্ছেদ করায় ইস্কুইজিশন তাকে পুড়িয়ে মারার জন্য রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে। চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে ইউরোপ তখনও মান্ধাতার যুগে নিমজ্জিত। স্পেনে মুসলমানদের আগমনে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সূচনা হয়। সার্জিকাল বিদ্যা ধর্ম নষ্টের কারণ যারা বলত সেখানে জন্মগ্রহণ করেন মুসলিম স্পেনের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বিজ্ঞানী আবুল কাসেম খালাফ আজ্জাহরাবী (৯৩৬-১০১৩ ঈসায়ী সন)। ইউরোপে 'বুকাসিস' আল 'জাহারভিয়াস' ইত্যাদি নামে পরিচিত। সমগ্র স্পেন তথা ইউরোপে সার্জিকাল বিদ্যা তিনিই সর্বপ্রথম প্রচলন করেন। হিট্টির মতে, স্পেনের আরব চিকিৎসাবিদদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ শল্যবিদ'। তার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'আত তাসরীফ' ২ খণ্ডে সমাপ্ত এবং ৩০টি অধ্যায়ে পরিব্যপ্ত। প্রথম খণ্ডে এনাটমী, ফিজিওলজী ও ডায়েটিটিক্স সম্পর্কে এবং শেষ খণ্ডে সার্জারী সম্পর্কে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। শেষ খণ্ডটিই এ বিষয়ে লিখিত সর্বপ্রথম সচিত্র শল্যবিদ্যা গ্রন্থ। বইটিকে সারটন 'Medical Encyclopaedia' নামে অভিহিত করেছেন। গ্রন্থের সবখানেই রয়েছে মৌলিকতার ছাপ। আবুল কাসেম আজ্জাহরাবীর গ্রন্থের সার্জারী অংশটি বহুবার বিদেশী ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। জিরার্ড মূল আরবী পাঠসহ 'De Chirurgia' নামে ল্যাটিনে প্রথম অনুবাদ করেন, এটি Salerno এবং Montepelliar বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক শতাব্দী যাবত পাঠ্য ছিলো। গ্রন্থে ২০০ প্রকার সার্জারীর যন্ত্রপাতির ছবি পরবর্তীতে ইউরোপের সার্জারীর যন্ত্রপাতির নমুনা হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

www.pathagar.com

ড. ক্যামপবলের মতে, এটি ৫ বার পরপর ল্যাটিনে অনূদিত হয় এবং খুবই প্রভাবশালী গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত। ইউরোপের The Restorer of Surgery নামে পরিচিত Guy de Chaulic তার গ্রন্থে ২০০ বার আবুল কাসেমের (Albucasis) প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। তাছাড়া Roger of Parma Lanfrance, Salicate প্রমুখ তার গ্রন্থ থেকে ঋণ স্বীকারপূর্বক বহু উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন।

আবুল কাসেমের 'আত্ তাসরীফ' নানা কারণে ইউরোপের অপরিহার্য সার্জিকাল গ্রন্থ। এম. আকবর আলীর কথায়, 'আবুল কাসেমের প্রকাশ ভঙ্গির মহিমায় প্যালেনের প্রভাব ক্ষুণ্ন হয়ে পড়ে। তাই ইউরোপ যখন বিজ্ঞানের দিকে অনেকটা এগিয়ে গেছে এবং আত্ তাসরীফের বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব অনেকটা কমে গেছে তখনও ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তার প্রভাব কমেনি। একটা কারণ তৎকালে সার্জারী সম্পর্কে ধর্মীয় রক্ষণশীল সমাজের বাঁকা দৃষ্টি অন্যটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের দীপ্যমান শিখা ইবনে সীনার আবির্ভাব। সচিত্র যন্ত্রপাতির উল্লেখ 'তাসরীফের' বিশিষ্টতার অন্য প্রধান দিক। ড. এম. আবদুল কাদের লিখেন, আরব নবজাগরণের পূর্বের অল্প কয়েকটি চিত্র পাওয়া গেছে সত্য, কিন্তু আবুল কাসেমের পূর্বে অস্ত্রোপচার যন্ত্রের চিত্রাঙ্কনের কোনো বিধিবদ্ধ চেষ্টা হয় নি। মধ্য যুগের অধিকাংশ চিত্র তার গ্রন্থ হতেই গৃহীত। অস্ত্র চিকিৎসার যাবতীয় পুস্তকে আজকাল যন্ত্রাদির চিত্রাঙ্কন অতি প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এই নব প্রবর্তনের জন্য বিজ্ঞান স্পেনীয় মুসলমানদের নিকট 'ঋণী'। আবুল কাসেমের লিখিত গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণের পাণ্ডুলিপি ইউরোপের গোথা, অক্সফোর্ডের Bodleian, প্যারিস, ফ্লোরেন্স, Bamberg, Francaise মন্টোপেলিয়ার ভেনিস রক্ষণাগারে সুরক্ষিত আছে, ১৪৭১ ঈসায়ী সন Liber servitoris sive liber নাম দিয়ে ভেনিস থেকে প্রকাশিত হয় সার্জারী অংশ। অনুবাদক যথাক্রমে Simon Januensi এবং Abraamo Judaeo ছিলেন। ১৪৯৭ ঈসায়ী সন Chirurgia Parva নাম নিয়ে ভেনিস থেকে আরেকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়

www.pathagar.com

এবং পরে একাধিক সংস্করণ বের হয়। ১৫৩২ খৃ. Schott-এর অনুবাদে Strassburg থেকে প্রকাশিত হয় এই নামে Albucasis methodus medendi cum instrumentis ad omnes fere morbos depicts এবং ১৭৭৮ সালে John Channing Oxford থেকে প্রকাশ করেন Albucasis de Chirurgia; এই অনুবাদের একটি কপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। ১৮৬১ ঈসায়ী সন Lucien Le Clere কর্তৃক ফরাসী অনুবাদ প্রকাশিত হয় প্যারিস থেকে।

আবুল কাসেম (বুকাসিস)-এর চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনায় দেখা যায়, তিনি কুষ্ঠরোগ, শিশুরোগ, রিকেট, কানের অসুখ, glucoma এর চিকিৎসা, শরীরে বিষক্রিয়ার পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ে মৌলিক আলোচনা করেছেন। তার গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় ৬টি।

www.pathagar.com

বাঙালী চিকিৎসাবিদ মুহাম্মদ আল মাহাদী বিন আলী আল হিন্দ সুনপুরী

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্থান পাবার মতো একজন বাঙালী চিকিৎসক আছেন– এ রকম তথ্য জানা যেত না কিছু দিন আগেও। বাঙালীদের গর্ব এই বিজ্ঞানীর নাম মুহাম্মদ আল মাহাদী বিন আলী আল হিন্দ সুনপুরী আল ইয়ামানী। তার লকব সুনপুরী (সুবর্ণপুর।) বাংলায় পরিচয় এবং ইয়ামেনের আল মুকরীতে স্থায়ী বসবাসকারী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি ইয়ামেনের আল মুকরীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। তার জীবন সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। সারটন তার Introduction to the History of Science গ্রন্থে তার সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, He was not a native of Yaman but a Hindu perhaps a Bengali. The obligation of the Pilgrimage drew Muslims from every where to the sacred cities, some of thrm never returned home but spent the rest of their life in the Hijaz or southern Arabia. Apparmently that is what happened to Muhammad Al-Mahadi, who settled down in Yaman. (Vol. 111 Part-2. Page-1215). সারটন তাকে হিন্দু বলে উল্লেখ করেছেন। এটা সঠিক নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন এম আকবর আলী। মুহাম্মদ আল মাহাদী (মৃত্যু-১৪৩২ ঈসায়ী সন) চিকিৎসা বিষয়ে রচনা করেন 'রহমা ফিততীব ওয়াল হিকমা' শিফা ওয়াল আজসাম, 'তাস হিলুল আনাফী ফিততীব ওয়াল হিকমা' ইত্যাদি গ্রন্থ। প্রথম গ্রন্থটি ৫টি ভাগে বিভক্ত এবং যথাক্রমে পদার্থ বিদ্যায়, খাদ্যবস্তু ও ঔষধ, স্বাস্থ্য, শরীরের বিভিন্ন অংশের রোগ এবং সাধারণ রোগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এটি কায়রোতে ১৩০০, ১৩০২, ১৩০৪ হিজরীতে মুদ্রিত হয়। শেষোক্ত সংস্করণের 'তিব্বুন নবী' নামে একটি খণ্ডও যোগ করা হয়। এই গ্রন্থ Prof. Florian Pharaon কর্তৃক ফরাসী ভাষায় অনূদিত এবং Prof. Alphonse Berthirand এর

www.pathagar.com

একটি ভাষ্যও প্রণয়ন করেন। সারটন উল্লেখ করছেন, He wrote kitab Al-Rahma Fil-Tibb wal Hikma (Book of Mercy concerning Medicine and (medical) Wisdom. It was wrongly ascribed to the Egyptian polygraph al-Suyuti. সারটনের এই শেষ বক্তব্য ঠিক নয়। এ সময় তুর্কীর মোহাম্মদ আল আকসারাই (মৃ.১৩৬৮/৭৮ ঈসায়ী সন) ইসহাক বিন মুরাদ, মোহাম্মদ ইবনে মাহমুদ, হাজী পাশা (মৃ. ১৪১৭ ঈসায়ী সন) এর নাম চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি বিশ্বকোষ, অনেকটা ইবনে সীনার 'কানুনের' অনুরূপ। প্রখ্যাত ফার্মাসিস্ট সিরাজের জয়নুল আত্তার (জ. ১৩২৯ ঈসায়ী সন) 'মিফতাহুল খাজায়েন' (Key of treasurs) ফার্সীতে লিখিত একটি মেটেরিয়া মেডিকো হিসেবে খ্যাত। এনাটমী বিদ্যা নিয়ে একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন মনসুর ইবনে মোহাম্মদ। 'তাশরীহুত তাসবির' নামক এই গ্রন্থ রচনা করেন মনসুর ইবনে মোহাম্মদ। 'তাশরীহুত তাসবির নামক এই গ্রন্থে মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, হাড়, স্নায়ু, পেশী, শিরা, ধমনী নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। সবচেয়ে সর্বশেষ বিদগ্ধ ব্যক্তি গ্রানাডার ইবনুল খতীব (জন্ম ১৩১৩ ঈসায়ী সন) চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর ৫টি গ্রন্থ রচনা করেন।

www.pathagar.com

উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ইবনুল বায়তার

প্রখ্যাত উদ্ভিদ ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ জিয়াউদ্দিন ইবনুল বায়তার দ্বাদশ শতকের শেষ-দিকে স্পেনের মালাহায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেভিলে শিক্ষা লাভ করেন। তার শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন আবুল আব্বাস আন নাবাতী, আবদুল্লাহ বিন সালেহ এবং আবুল হাজ্জাজ প্রমুখ। ইবনুল বায়তার সেভিলের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে লতাগুল্ম সংগ্রহ করতেন। ১২০০ সালে তিনি ভ্রমণে বের হন। মরক্কো, আলজেরিয়া তিউনিসিয়া ভ্রমণের পর সিরিয়া ও এশিয়া মাইনর ভ্রমণ করেন। মিসর ভ্রমণকালে তখনকার আইয়ুবী সুলতান মালিকুল কামিল তাকে মেডিসিন বিশেষজ্ঞদের প্রধান নিযুক্ত করেন। কায়রোতে বসে তিনি তার বৈজ্ঞানিক গবেষণা অব্যাহত রাখেন। পরে তিনি দামেশকে স্থিত হন এবং ১২৪৮ সালে এখানেই মৃত্যুবরণ করেন। ইবনুল বায়তার রচিত গ্রন্থাবলীতে তার ঔষধ বিষয়ক গবেষণা পরিস্ফুটিত হয়েছে। 'আল মুগনী ফিল আদরিয়াতিল মুফরাদা' গ্রন্থে তিনি প্রতিটি রোগের সঠিক ঔষধের বর্ণনা দিয়েছেন। তার সর্ববিখ্যাত ও বহু ভাষায় অনূদিত 'আল জামি লি মুফরাদাতিল আদরিয়া ওয়াল আগযিয়া' গ্রন্থটিতে নিজস্ব পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ১৪০০ টি ঔষধি, প্রাণী, শাক-সবজি এবং খণিজ দ্রব্যের বর্ণনাক্রমিক তালিকা প্রদান করেছেন। এছাড়া উক্ত গ্রন্থে তিনি প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আর রাজী, ইবনে সীনা, আল ইদরীসী এবং আল গাফিকীসহ প্রায় ১৫০ জনের বেশি বিশেষজ্ঞের পর্যবেক্ষণের বিবরণ দিয়েছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এই গ্রন্থটির বিশেষ প্রভাব ছিলো।

চিকিৎসা, ঔষধ এবং উদ্ভিদ বিষয়ে ইবনুল বায়তারের অন্যান্য রচনার মধ্যে রয়েছে– 'মীযানুত তাবীব', 'রিসালা ফিল আগযিয়া ওয়াল আদরিয়া, মাকালা ফিল লিমুন প্রভৃতি। এছাড়া Dioscorides-এর ভাষ্যেও তার একটি মূল্যবান পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে, যাতে ৫৫০টি ঔষধির তালিকা রয়েছে।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, চিকিৎসা ও উদ্ভিদবিদ ইবনে আবী ওসাইবিয়া ছিলেন তার সুযোগ্য ছাত্র। ইবনুল বায়তারের একাধিক গ্রন্থ ইউরোপে অনূদিত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিত Guilaume Postel (1510-1581) প্রথম ইবনুল বায়তারের সম্পূর্ণ রচনাবলী নিয়ে গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। এর পূর্বে এবং পরে অবশ্য তার বিভিন্ন রচনা অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। তার লিখিত ৯টি গ্রন্থের নাম জানা যায়।

www.pathagar.com

উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ইবনে জুলজুল (৯৪৪-৯৯৫)

প্রখ্যাত আরব চিকিৎসাবিদ আবু দাউদ সোলাইমান ইবনে হাসান আল আন্দালুসী ৯৪৪ ঈসায়ী সন কর্ডোভায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯৯৪ সালের পর ইন্তেকাল করেন। তিনি ইবনে জুলজুল নামে ইতিহাসে খ্যাত। মাত্র ১৫ বছর বয়সে চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি তার বিশেষ ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। এর দশ বছর পরে তিনি দেশের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত হন। তিনি হিশাম (৯৭৭-১০০৯ ঈসায়ী সন) এর ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত হন।

ইবনে জুলজুল রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে, 'তাফসীরে আনওয়ায়ে আল আদবিয়াহ মিন কিতাবি দিয়ুসকুরীদুস' ৯৮২ সালে লিখিত হয়, যার একটি পাণ্ডুলিপি মাদ্রিদে বর্তমান রয়েছে। চিকিৎসাবিদগণের ইতিহাস নিয়ে তার মূল্যবান রচনা 'তাবকাতুল আতিব্বা ওয়াল হুকামা' ৯৮৭ সালে রচিত হয়। অন্যান্য রচনার মধ্যে রয়েছে–

১. মাকালা ফি যিকরিল আদবিয়া আল্লাতি লাম ইয়ায়কুরহা দিয়ুসকুরীদুস।

২. মাকালা ফি আদবিয়াতিত তিরযাক।

৩. রিসালাতুত তাবয়ীন ফি মা গালাতা ফিহী বা'দুন মুতাতাব্বিবীন।

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (১ম খণ্ড) - ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

২. মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস - কে. আলী

৩. হযরত মুহাম্মদ (সা.) : জীবনী বিশ্বকোষ - আফযালুর রহমান (লণ্ডন)

৪. দৈনিক ইনকিলাব (২৯শে পৌষ, ১৩৯৯ সংখ্যা)।

৫. The Encyclopaedia of Islam - Vol III, Leiden, 1979

৬. মুসলমানদের দান (৮ম খণ্ড), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮

৭. বিজ্ঞানে মুসলমানদের দান (৮ম খণ্ড), এম আকবর আলী, ২০০০

৮. Encyclopaedia Britanica - Vol (2), 1973

৯. দ্য স্পিরিট অব ইসলাম- সৈয়দ আমীর আলী, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩

১০. আরব জাতির ইতিহাস- মুহাম্মদ রেজা-ই করিম, বাংলা একাডেমী, ২০০০

১১. Encyclopaedia of Islam. Vol-iii/ Brill, London, 1979.

১২. ইসলামী বিশ্বকোষ - ৪ খণ্ড, ইফাবা প্রকাশিত।

১৩. ইবনে সীনা - মুজিবর রহমান, ২০০৩।

১৪. বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান - মুহাম্মদ নূরুল আমীন, ২০০৩।

১৫. মুসলিম মনীষা - আবদুল মওদুদ, ইফাবা।

www.pathagar.com

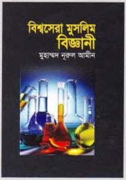

আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন বাংলাবাজার মগবাজার
www: ahsanpublication.com
ISBN: 978-984-90135-2-5

www.pathagar.com